নতুন বছরের রাশিফল | সেলেবদের বিবাহ বিচ্ছেদ | কিন্নর রায়ের ধারাবাহিক

RNI: WBBEN/2013/50948

নতুন বছরে
নতুন সিনেমা

জানুয়ারি ২০১৪, তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা দশ টাকা

বাংলা সমসাময়িক

সিনেমায় কর্নেলের ফার্স্ট লুক
এই প্রথম সমসাময়িক বাংলায়

যে গোয়েন্দাদের নিয়ে সিনেমা হল না

ব্যোমকেশই সেরা

টিকটিকি

বাংলার গোয়েন্দাদের নিয়ে রোমাঞ্চকর সংখ্যা

RNI: WBBEN/2013/50948

বাংলা সমসাময়িক

জানুয়ারি ২০১৪, তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২

নিউজ মেকার ৩

প্রচ্ছদ নিবন্ধ ঃ টিকটিকি

চিরঞ্জিতের সাক্ষাৎকার ৭

রাজা সেনের সাক্ষাৎকার ৯

সিরাজের সাহিত্যে কর্নেল ১০

আবীর চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার ১৪

ফেলু মিত্তিরের এবিসিডি ১৫

মসনদে ব্যোমকেশ ১৭

সিনেমায় ব্যোমকেশ ১৯

কাকাবাবুর জনপ্রিয়তার ইউএসপি ২১

টিনটিনের সিনেমা ২৪

টিনটিনের অভিযান ২৯

সিনেমায় ব্রাত্য গোয়েন্দারা ৩২

কুইজের পাতায় গোয়েন্দাগিরি ৩৫

গল্প

দশ ফুট বাই দশ ফুট
আলোকপর্ণা ৩৭

ধারাবাহিক ফিচার

অচেনা মিঠুন
চণ্ডী মুখোপাধ্যায় ৪০

ধারাবাহিক উপন্যাস

শ্রীচৈতন্যধারা
কিন্নর রায় ৪৩

ধারাবাহিক স্মৃতিচারণা

কোন সুধাশ্যামলিম শান্তিনিকেতন
অতনু শাশমল ৪৯

রাশিফল ৫২

ডক্টর'স চেম্বার

সিওপিডির আশঙ্কায় শীতকাল
দেবযানী আইচ ৫৪

মাসের আয়না

মেলার মাস
সুমিতাভ ঘোষাল ৫৬

কবিতা

সানাউল্লাহ সাগর, টোকন মান্না, মোনালিসা পাল, সুভান, লিটন রাকিব ৫৯

বিনোদন

সেলেবদের বিবাহ বিচ্ছেদ
শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী ৬১

সিনেমা

নতুন বছর নতুন সিনেমা
শালিনী চট্টোপাধ্যায় আহুজা ৬৩

ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় ভর্তির সময়েই চাকরির নিয়োগপত্র

বিগত ১৫ বছর যাবৎ ১০০% চাকরি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নজির সৃষ্টি করেছে

UGC-DEC স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সার্টিফিকেট ও সঙ্গে সঙ্গে মোটা মাইনের চাকরির লিখিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে TURNING POINT

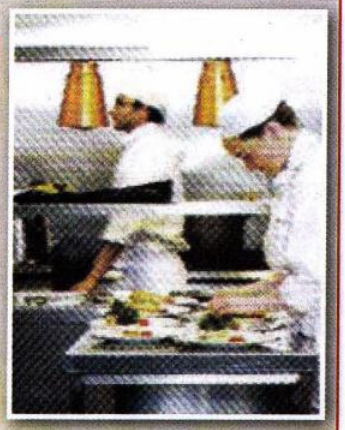

২০১৩ সেশনে ভর্তি শুরু হয়েছে

- 3 yrs B.Sc. Hotel Management
- 1-2/2 yers. Diploma in Hotel Management & Catering
- 6 months Certificate in Hotel Operation

কোর্স চলাকালীন ও কোর্স শেষে আপনি পাবেন

● অ্যাডভান্স প্র্যাক্টিক্যাল ল্যাব ● স্পোকেন ইংলিশ ও কম্পিউটার ও ক্লাসের সুযোগ ● ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক হোটেলের সুবিধা ● SC, ST, OBC, Girls, Defense Candidate-দের জন্য কোর্স ফি-র ওপর ১০% ছাড় ● কোর্স চলাকালীন স্টার হোটেলে Industrial Training ● কোর্স শেষে ভারত ও বিদেশে ১০০% নিশ্চিত চাকরির সুযোগ

TURNING POINT

School of Hotel Management

AD-206, Sec-1, Near Tank No.-4, Salt Lake, Kolkata-700764,
Ph.-933110509, 9836882575.
Web: www.kolkatatatp.com

প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক
সায়নদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিজাইনার ও হরফবিন্যাস
দেবাশিস রায়চৌধুরি
রীনা দাস

প্রচ্ছদ
সৌরীশ মিত্র

ব্যবস্থাপনা
সমীর চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞাপন
সৌম্য গুহরায়

সার্কুলেশন
দিলীপ কুমার মণ্ডল
সুব্রত বিশ্বাস

প্রযোজনা
প্যারাডাইস ক্রিয়েটর

এস বি মিডিয়ার নিবেদন

যোগাযোগ
ফ্ল্যাট ১এ, ১৪৭/১ পিজিএইচ শাহ রোড, যাদবপুর, কলকাতা-৩২

ওয়েবসাইট
www.samasamayikbangla.com

ফেসবুক
https://www.facebook.com/samasamayikbangla.in

ইমেল
sayandeb.b.banerjee@gmail.com
samasamayikbangla.patrika@gmail.com
info@samasamayikbangla.com

ফোন : ৮৩৩৫০৫০৯৭১/৮৩৩৫০৫০৯৭৬

সম্পাদকীয়

স্যান্ট্রো এবং ওয়াগন-আর ভারতীয় রাজনীতিতে বিপ্লব নিয়ে এল। দুটো গাড়িরই ছোট্টখাট্ট চেহারা। দামও একেবারেই নাগালের মধ্যে। আম আদমি এই দুটো গাড়ির সঙ্গে বহুদিন ধরে ভারতের রাস্তায় একাত্মতা বোধ করছে। অথচ এই দুই গাড়ির সওয়ারি এই মুহূর্তে দেশের দু'টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। স্যান্ট্রোর সওয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর ওয়াগন-আর-এর ওপর যিনি আস্থা রেখে চলেছেন, তাঁর নাম অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সাধারণ মানুষের মন পাওয়ার জন্য একেবারে গাড়ি দিয়েই যাত্রা শুরু করেছেন এই দু'জন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধারণ বেশভূষা নীল-সাদা চপ্পল নিয়ে এর আগে অনেক কথা লেখা হয়েছে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মাফলারে ঢাকা কান তাঁকে শীতে কাবু এক সাধারণ ভারতীয় হিসেবেই তুলে ধরছে। দু'জনেই দু'টি বড় হার্ডল পেরিয়েছেন সাধারণ মানুষকে সঙ্গী করেই। এই বছর ভারতে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দু'জনেরই লক্ষ্য দিল্লির তখ্‌তের দিকে। দু'জনের অসাধারণ যাত্রার দিকে নজর রাখছে 'সমসাময়িক বাংলা'। নতুন দল গড়ে সাফল্য পাওয়ার জন্য এবার নিউজ মেকারে শীর্ষস্থানে আছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

সমসময়ে, বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনি নিয়ে সিনেমা করার একটি প্রবণতা তৈরি হয়েছে। ফেলুদা এবং ব্যোমকেশ বক্সীকে নিয়ে ছবি হচ্ছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কর্নেলকেও রাজা সেন হাজির করছেন সেলুলয়েডে। পর্দায় কেমন হবে তার চেহারা— সেই ফার্স্ট লুক কেমন, সব জানা যাবে 'সমসাময়িক বাংলা'র জানুয়ারি সংখ্যাতেই। বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দাদের গতিবিধি, অভিযান পরিচালনায় লেখকদের কৃতিত্ব, তাঁদের সিনেমাটিক বর্ণনা— সবকিছু নিয়েই এবারের জমজমাট সংখ্যা 'টিকটিকি'। পাঠকদের এটা জেনে ভালো লাগবে যে এই জানুয়ারি মাসেই শার্লক হোমসের ১৬০ বছর বয়স হল। সেদিক থেকে এই সংখ্যা গোয়েন্দাদের কাজের প্রতি একটি ট্রিবিউটও বটে। যদিও এই সংখ্যায় হোমস নেই। একমাত্র বিদেশি গোয়েন্দা হিসেবে উপস্থিত থাকছেন টিনটিন।

যত উষ্ণতা কমছে কলকাতার, তত এগিয়ে আসছে কলকাতা বই মেলার দিনগুলি। 'সমসাময়িক বাংলা' এবারও, তৃতীয়বারের জন্য মেলার মাঠে স্টল দিচ্ছে। 'সমসাময়িক বাংলা'র স্টল নম্বর ২৯৯। সমস্ত পাঠককে আমাদের স্টলে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। মিলন মেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের উল্টো দিকেই থাকবে 'সমসাময়িক বাংলা'র স্টল।

এই বছর কলকাতা বই মেলার স্টল থেকে প্রকাশনাতেও হাত পাকাবে 'সমসাময়িক বাংলা'। সমসাময়িক প্রকাশনা এবারের কলকাতা বই মেলায় বেশ কয়েকটি বই প্রকাশ করবে। পরবর্তী সংখ্যায় প্রথম দফার পুস্তক তালিকার বিজ্ঞাপন বিস্তারিত প্রকাশ করা হবে। প্রায় আড়াই বছর 'সমসাময়িক বাংলা' পত্রিকা পাঠকদের কাছ থেকে যে সমাদর পেয়ে এসেছে, আমরা নিশ্চিত, এই গোষ্ঠীর প্রকাশনার প্রতি পাঠকরা তেমনই সমর্থন জোগাবেন।

সব পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীকে জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।

রাজনীতিতে প্রবেশের আগে সিনেমার পর্দা থেকে নিজেকে এক রকম সরিয়েই নিয়েছিলেন তিনি। শুধু অভিনয় নয়, উৎসাহ হারিয়ে গিয়েছিল পরিচালনার কাজ থেকেও। কিন্তু সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'কর্নেল' চরিত্রই আবার তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে টিনসেল টাউনে। চিরঞ্জিতের খোলামেলা সাক্ষাৎকার নিয়েছেন 'সমসাময়িক বাংলা'র প্রতিনিধি **নিবেদিতা ঘোষরায়**

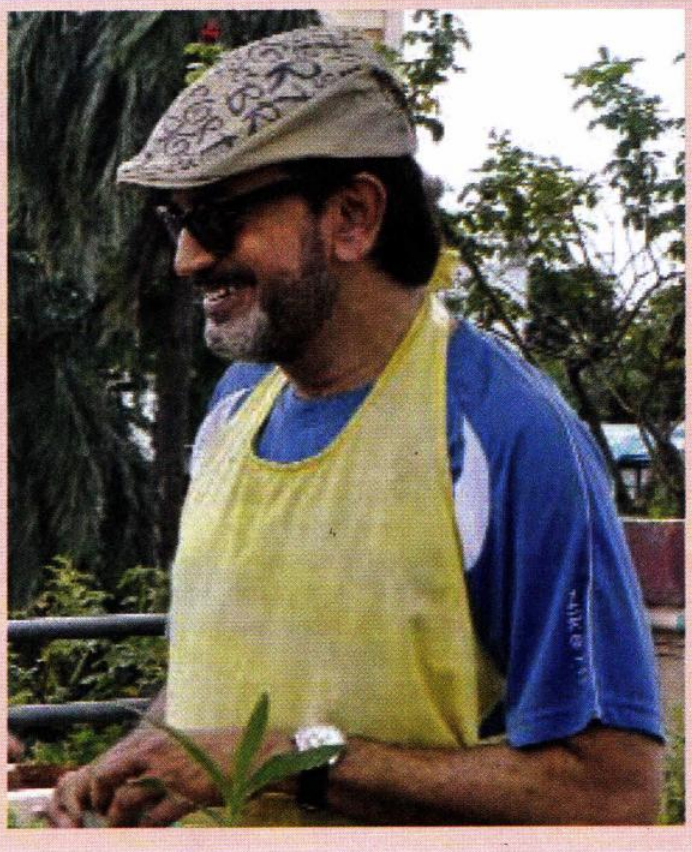

কর্নেলের ফার্স্ট লুক

■ আমরা ছোট থেকে প্রত্যেক পূজাবার্ষিকীতে একটা করে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কর্নেল নীলাদ্রি সরকার উপহার পেয়েছি। ছবিতে কোন গল্পটা হয়েছে?

চিরঞ্জিত- গল্পের নামটা এই মুহূর্তে আমার মনে নেই। রাজা (পরিচালক রাজা সেন) জানে। তবে গল্পটার লোকেশন কলকাতা। আউটডোর সেভাবে নেই।

■ এতদিন বাদে কর্নেল রূপে কামব্যাক করে কেমন লাগছে?

চিরঞ্জিত- কামব্যাক বোলো না। আমি ছিলামই। দেবের সঙ্গে শুটিং হচ্ছে। 'বস' করলাম, বেরিয়ে গেছে। অতনু ঘোষের একটা ছবির শুটিং 'সে' শুরু হবে। সৃজিতর সঙ্গে 'চতুষ্কোণ' করার কথা হয়েছে। 'নিউ এজ' ছবিতে আমি আছি। রাতুল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা ছবিতে 'সমকামী' চরিত্রে অভিনয় করেছি। ঋতুপর্ণার বিপরীতে। ভালো কাজ করার খিদেটা তো থেকেই যায় কোনও প্রকৃত শিল্পীর। সময়ের অপেক্ষা করতে হয় এই যা।

■ কর্নেল তো একটা বিশেষ ইমেজারি চরিত্র, আপনিই প্রথম করছেন, সে অর্থে কামব্যাক বলছি।

চিরঞ্জিত- চরিত্রটা করতে আমার খুব ভালো লেগেছে। চরিত্রটায় এত পাবলিসিটি হয়েছে জানতাম না। যা-ই হোক, যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে সিরিজ করব— এটা আমাদের প্ল্যানিঙে আছে।

■ কর্নেলের যে ছাঁচ বা ইমেজ, মানে কর্নেল তো টিপিক্যাল ডিটেকটিভ নয়, এক এক্স-মিলিটারি পারসন, তা সেটাই শো করবেন আপনি, না নতুন কিছু?

চিরঞ্জিত- আমি চরিত্রটা যেভাবে ডিল করেছি, ইউনিটের সবাই তো উচ্ছ্বসিত। একেবারে আনইউজুয়ালি করেছি। যেটা করেছি, কর্নেল যাতে ডিফরেন্ট হয়। ফেলু না হয়, কাকাবাবু না হয়, ব্যোমকেশ না হয়। ভালো ছবি তো, এগুলো সব অনেক সুবিধে নিজের মতো করার।

■ ভালো ছবি বলতে কী বোঝাচ্ছেন?

চিরঞ্জিত- বাণিজ্যিক মশলাদার ছবি নয়, সাহিত্যনির্ভর ছবি। অবশ্য বাণিজ্যিক সব ছবিই। ট্রিটমেন্টটা আলাদা। যেগুলোকে নিউ এজ ছবি বলা হচ্ছে।

■ কর্নেল তো অনেক এজেড, গ্লোবালাইজেশনের পরের চরিত্র। ওঁকে কি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মডার্নাইজ করে দেখানো হয়েছে? যেমন কাকাবাবু সেল ফোন ব্যবহার করেছে, টুইট করছে?

চিরঞ্জিত- অতটা ঠিক নয়। গল্পই অনুসরণ হয়েছে বেশি। তবে

আধুনিকতা আছে। ল্যাপটপ এসেছে। আমরা ল্যান্ড ফোন তুলেই কথা বলেছি। লেখকের যে নির্মাণ, সেই পুরোনো রসটাই রাখা হয়েছে।

■ মানে, না ঘরকা না ঘাটকা, ধরি মাছ না ছুঁই পানি। কিছু আলগা প্রযুক্তি বসিয়ে দেওয়া হয়নি।

চিরঞ্জিত- না, মিক্স-আপ কিছু হয়নি।

■ আচ্ছা, বাংলা সাহিত্যের গোয়েন-দারা তো সব সিনেমায় নেমে পড়েছে। গোয়েন-দিদিরা আসছে না কেন?

চিরঞ্জিত- হ্যাঁ, এলে তো ভালোই হয়। মিস মার্পলরা আসুন না। আসা তো উচিত। ঋতুপর্ণ তো এর একটা সূত্রপাত করেই গেছে 'শুভ মহরত'-এ। সেই বুদ্ধিমতী পিসিমা। একেবারে ঘরে বসে রহস্য সমাধান। ওই ক্যারেকটারটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। গল্পটা আগাথা ক্রিস্টি থেকেই নেওয়া। তোমাকে একটা কথা বলি, সত্যটা হল, বেসিক্যালি বাংলা ফিল্মের বাজারে গোয়েন্দা গল্প চলে না। কেননা গোয়েন্দা গল্পের রিপিট হয় না। একবার রহস্যটা জেনে গেলে দু'বার পাবলিক হলে দেখতে যায় না। সেকেন্ড টাইম, থার্ড টাইম না দেখলে পয়সাটা ওঠে না। তবে এখন যা হচ্ছে, ভালো ছবি করার জন্য ফিনান্স আসছে। সেটা আগে ছিল না। এখন টাকা অন্যভাবে উঠে আসে। সিডি রাইট আছে, স্যাটেলাইট রাইট আছে। তাই এত সাহিত্যনির্ভর ছবি, গোয়েন্দা, ফ্যান্টাসি, ভূত— এত এক্সপেরিমেন্টাল ছবি হচ্ছে।

■ আচ্ছা, পলিটিক্যাল, সাবঅলটার্ন, মিডিয়া ক্রাইসিস, ড্রয়িং রুম ড্রামা, রিলেশন, অ্যাডভেঞ্চার, ভূত— সব কিছুর মধ্যে গোয়েন্দা গল্পের চাহিদা এত কেন? মানুষের কি প্রবলেম, ক্রাইসিস বেড়ে গেছে? যেগুলো নিয়ত আনসলভড থাকছে?

চিরঞ্জিত- একটা কমার্শিয়াল সেট-আপের ছবি করতে গেলে বাজেট কয়েক কোটি টাকা। ফাইট, অ্যাকশন, লোকেশন, নাচ, গান, একটা গানের বাজেট তিন কোটি, হিন্দিতে একটা প্রপার অ্যাডভেঞ্চার ফিল্ম করতে প্রচুর খরচ, যেমন চাঁদের পাহাড় ১৫ কোটি টাকার ছবি। যেমন বিদেশি থ্রিলারগুলো। নো বাজেট অথচ একটু রহস্যের আঁচ পোহানো যাবে, একটু অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ, একটা সাসপেন্স থাকে। এই জন্যই সব গোয়েন্দা গল্প ঢুকে পড়েছে। এ ছাড়া আরও একটা কারণ, যেটা তুমি পয়েন্ট আউট করলে। ডেফিনিটলি ক্রাইম ও সেই সঙ্গে মানুষের ক্রাইসিস বেড়েছে। মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষও জড়িয়ে পড়ছে এর সঙ্গে। লাইফ স্প্যানটা অনেক ছড়িয়ে পড়েছে। আগে কম্পিউটার হ্যাকিঙের নাম কেউ জানত? অনেক কিছুই সমাধান হচ্ছে না। আরুষি তলোয়ারকে কে মেরেছে, বাবা-মা মেরেছে কি না তা এখনও ধোঁয়াশায়, অনেক রেপ কেস আনসল্ভড। রহস্যের প্রতি একটা কমন ইন্টারেস্ট ছিলই। তা অনেকটা বেড়ে গিয়ে পারসোনাল লাইফের মধ্যে এসে পড়েছে, মিডিয়া এত সক্রিয়। স্ত্রীকে টুকরো করে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, এত ভয়ঙ্কর ক্রাইম আগে ছিল না। স্টিং অপারেশনও এখন এসে গেছে, সেটাও একটা গোয়েন্দাগিরি।

■ কর্নেলকে যারা জানে না, যারা পড়েনি, সাধারণ দর্শক, যারা একটা গোয়েন্দা গল্পের ছবি ভেবে হলে যাবে, তাদের কাছে কর্নেলকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে?

চিরঞ্জিত- হ্যাঁ, কর্নেলের চরিত্রের দিকগুলো বলা হয়েছে। সে শুধু বুদ্ধির খেলা খেলে না, সে প্রকৃতিসচেতন, বনসাইপ্রেমী, প্রজাপতি ধরে বেড়ায়, অর্কিড কালেকশন করে। বেশ পরিহাসপ্রেমী, রিল্যাক্সড অ্যাটিটিউডে থাকে। এটা চিরন্তন।

■ কর্নেলকে বাংলার দর্শক কবে দেখবে? রিলিজ কবে?

চিরঞ্জিত- 'আশ্চর্য প্রদীপ'-এর পর তো রিলিজ হওয়ার কথা ছিল। কোনও উচ্চবাচ্য তো দেখছি না। রোজ ভ্যালি প্রোডাকশনের ব্র্যান্ড ভ্যালুর ব্যানারে রিলিজ করছে। আমি একটা নতুন ডিরেক্টরের 'মণিহারা দ্য মুভি' নামে ছবি করেছি। সেখানেও আমি ইনভেস্টিগেট করছি, এক্স-সিবিআই অফিসার। মণিহারা ছবির ছায়া আছে, একটি বউয়ের গয়নার প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা, তারপর অন্তর্ধান, গয়না চুরি, শেষটায় একটু ভূতের ছোঁয়া আছে। খুব মজার। প্রথম থেকে বোঝাই যাবে না কী করে কী হল।

'আশ্চর্য প্রদীপ'-এর পর তো রিলিজ হওয়ার কথা ছিল। কোনও উচ্চবাচ্য তো দেখছি না। বেসিক্যালি বাংলা ফিল্মের বাজারে গোয়েন্দা গল্প চলে না। কেননা গোয়েন্দা গল্পের রিপিট হয় না।

■ কর্নেলের গল্পে হালদার মশাই বলে একজন এক্স-পুলিশ অফিসার থাকে, যে খুব খাটাখাটনি, দৌড়োদৌড়ি করে, কিন্তু আলটিমেটলি কর্নেলের ব্রেন ইউজ হয়। এখানেও আছেন তিনি?

চিরঞ্জিত- হ্যাঁ থাকছে। স্বরাজ মুখোপাধ্যায় করছে। তাপসও আছে একটা প্রধান চরিত্রে।

■ আর কর্নেলের সহকারী সাংবাদিক জয়ন্ত?

চিরঞ্জিত- অবশ্যই আছে। সাহেব করছে।

■ তাহলে আমরা সহকারীসহ একজন কমপ্লিট গোয়েন্দা পাচ্ছি?

চিরঞ্জিত- হুঁ। বলতে পারো একজন অন্য মাত্রার গোয়েন্দা পাচ্ছ।

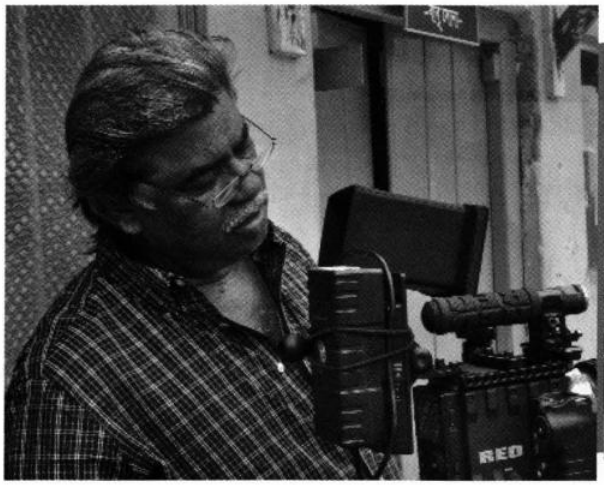

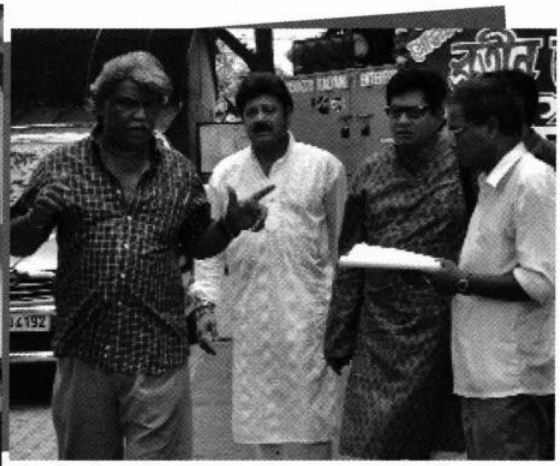

মুক্তি নেই কর্নেলের

অলক্তা মাইতি

পরিসংখ্যান বলছে গোয়েন্দাদের বাজার নাকি অসম্ভব ভালো। বৃহস্পতি সত্যসন্ধানীদের কুণ্ডলীতে একেবারে তুঙ্গে অবস্থান করছে। ফেলুদা, ব্যোমকেশ তো ছিলই, তার সঙ্গে কাকাবাবুর 'মিশর রহস্য'র পর সমস্ত রহস্যর অবসান ঘটেছে। প্রযোজকরা এখন গোয়েন্দা দেখলেই সোজা চালান করে দিচ্ছে বক্স অফিসে। শুধু টালিগঞ্জই না, মুম্বইতেও ছোঁয়াচ লেগেছে বাঙালি গোয়েন্দার। যশরাজের মতো বড় ব্যানারও ব্যোমকেশ নিয়ে ছবি করতে আগ্রহ দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন যে আদতে এই সময় গোয়েন্দা গল্পের দর্শক আছে। রহস্য-রোমাঞ্চের এই বাড়বাড়ন্তের মধ্যেও মুক্তির অপেক্ষায় হাঁসফাঁস করছে রাজা সেনের 'কর্নেল'। পরিচালক হিসেবে রাজা সেন চিরকালই বিভিন্নতার দিকে আগ্রহ দেখিয়েছেন। একাধারে যেমন 'দামু'র মতো ছবি আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি, ঠিক তেমনি 'আত্মীয়স্বজন', 'দেশ', 'দেবীপক্ষ', এমনকী সাহিত্যনির্ভর ছবি 'ল্যাবরেটরি' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'ও ফ্রেমবন্দি করেছেন রাজা সেন। সেই ভার্সেটিলিটিকে আর একটু উসকে দিতেই বোধহয় গোয়েন্দা গল্পে হাত পাকানো। কিন্তু এতশত থাকতে হঠাৎ কর্নেল কেন? প্রশ্নের উত্তরে এক ফোঁটা রাখঢাক না করে রাজা সেন বললেন, 'দেখুন, ফেলুদা তো কপিরাইটজনিত কারণে সন্দীপ রায়ের হাতে। ফেলুদা উনিই করছেন বা করবেন। ব্যোমকেশ নিয়েও অনেকেই কাজ করছে। কাকাবাবু নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কাকাবাবুও তিন বছরের জন্য ভেঙ্কটেশের কেনা হয়ে আছে। তাহলে অপশন বাঁচল কিরীটী আর কর্নেল। সাধারণ দর্শকের কথা মাথায় রেখে মনে হল কর্নেল ভালো হবে। তাই করলাম।' কোন গল্প অবলম্বনে ছবি? নাহ্, ঠিকঠাক কোনও নাম জানা গেল না পরিচালকের কাছ থেকে। ভাসা ভাসা উত্তরে যতটুকু বোঝা গেল তা হল, সিনেমা জগৎকে কেন্দ্র করে একটা মার্ডার মিস্ট্রি। গল্প সম্পর্কে খোদ পরিচালকের উক্তি, 'নিঃসন্দেহে এটা কর্নেলের শ্রেষ্ঠ গল্প না, কিন্তু কলকাতায় শুটিং করার সুযোগ আছে, বাজেট ইত্যাদির ক্ষেত্রেও গল্পটা সুবিধাজনক, তাই এই গল্পটাই বাছা হল।' সিনেমার বিষয় থেকে চরিত্র নির্ধারণ, এমনকী গল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও যেখানে বাজেট এবং বাজারকেই প্রধান উপজীব্য বিষয় হিসেবে বিচার করা হয়েছে, এমন একটি বাণিজ্যিক সিনেমা ২০১২-য় সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়েও এখনও কেন প্রেক্ষাগৃহের মুখ দেখল না, সেটা সত্যি রহস্য। পরিচালক বিষয়টাকে প্রযোজক সংস্থার সিদ্ধান্ত বলে পাশ কাটাতে চাইলেও, এক বছরের বেশি সময় যাবৎ তৈরি ছবি রিলিজ না করাটা যে মোটেই সুখকর নয় তা স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর অভিব্যক্তিতেই। ঠিক সময়ে রিলিজ করলে 'মিশর রহস্য'র আগেই আমরা হয়তো কর্নেলের দেখা পেতাম। সেক্ষেত্রে নিজের সময়ের দুই সুপারস্টারের বক্স অফিস দখলের খেলাটা যে ভীষণরকম উপভোগ্য হয়ে উঠত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কর্নেলের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য চিরঞ্জিত হোমওয়ার্কে কোনওরকম খামতি রাখেননি। পরিচালকের মতে, এই বিশেষ চরিত্রে চিরঞ্জিত ভীষণভাবে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছেন তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা এবং সপ্রতিভ দুটো চোখের কারণে। ছবিতে চিরঞ্জিত ছাড়াও সব্যসাচী চক্রবর্তী আছেন একটি বিশেষ চরিত্রে। আছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, শঙ্কর চক্রবর্তী, সাহেব চট্টোপাধ্যায় এবং তাপস পাল।

গল্পের নাম মনে নেই খোদ পরিচালকের

সব মিলিয়ে বাণিজ্যিক মশলার অভাব নেই। ভালো অভিনেতা থেকে ভালো মিউজিক, এমনকী রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালকের হাতে পড়েও ঠিক কী কারণে মুক্তি পাচ্ছে না কর্নেল, সেই নিয়ে জল্পনা এখন তুঙ্গে। প্রযোজকদের নীতি নির্ধারণ এবং সংশয়ের মুখে তাহলে কি পুরোপুরি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে কর্নেলের অভিষ্যৎ? পরিচালক এখনও পুরোপুরি আশা ছাড়েননি। হয়তো বা ২০১৪-র ফেব্রুয়ারিতে মুক্তি পেতে পারে কর্নেল, কিন্তু প্রযোজকদের তরফ থেকে এখনও কোনও হেলদোলের দেখা নেই।

পাখি, প্রজাপতি আর হত্যা-রহস্য

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

সে এক দিন ছিল!

তখন সারারাত খবরের কাগজের অফিস কাজ করে ফেরা সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরীর বেডসাইড টেবিলে রাখা টেলিফোন সকাল ন'টা, দশটা বা এগারোটার সময়ে বেজে উঠলে ঘুমিয়ে কাদা জয়ন্ত রিসিভার তুলে ঘুম জড়ানো স্বরে বলে উঠত, 'রং নাম্বার।' আর ফোন নামিয়ে রাখার আগেই ও প্রান্ত থেকে ভেসে আসত, 'রাইট নাম্বার ডার্লিং।'

কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের কণ্ঠস্বর শুনে এক ঝটকায় ঘুম থেকে উঠে তার ফিয়াট গাড়িটি নিয়ে কর্নেলের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়ত জয়ন্ত। কর্নেল সরকার, জয়ন্ত, হালদার মশাই, আর কাহিনির অন্য চরিত্রের সঙ্গে পাঠক-পাঠিকাদের এক আশ্চর্য রহস্যের জালে জড়িয়ে গল্পের শেষ পর্যন্ত ছুটিয়ে নিয়ে যেতেন কর্নেলের স্রষ্টা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।

মধ্য কলকাতার ইলিয়ট রোডের সানি ভিলা নামক বাড়ির তিনতলার ফ্ল্যাটে থাকেন কর্নেল সরকার। ফ্ল্যাটের অপর বাসিন্দা চাকর ষষ্ঠীচরণ। অবশ্য বাসিন্দা যে আর নেই তা নয়, যেমন অজস্র জ্যান্ত এবং মরা পোকামাকড়, প্রজাপতি, আর বিভিন্ন অদ্ভুত প্রজাতির গাছ আর ক্যাকটাস। তবে ক্যাকটাস বা গাছপালার বেশির ভাগ থাকে সানি ভিলার ছাদে, যেখানে জাল দিয়ে ঘেরা বাগান কর্নেলের। ষষ্ঠীর ভাষায় 'শূন্যোদ্যান'।

কর্নেল সরকার রহস্যভেদ করে থাকলেও নিজেকে তিনি ডিটেকটিভ বা গোয়েন্দা আখ্যা দিতে একেবারেই পছন্দ করেন না। নিজস্ব অভিধায় তিনি হলেন প্রকৃতিবিদ বা নেচারিস্ট। ভিজিটিং কার্ডেও তা-ই লেখা থাকে। কিন্তু প্রায়শই পুলিশ, পূর্বপরিচিত ব্যক্তি কিংবা নিতান্ত অচেনা মানুষের ডাকে কর্নেলকে জড়িয়ে পড়তে হয় বিভিন্ন তদন্তে। সেগুলির বেশির ভাগই খুন। কখনও তার সঙ্গে প্রাচীন গুপ্তধন উদ্ধার, অন্তর্ধান, ভূতুড়ে কাণ্ড ইত্যাদিও জড়িয়ে থাকে। কিন্তু এ হেন রহস্যভেদী হয়েও কর্নেল নিজেকে গোয়েন্দা বলতে চান না কেন? এই প্রসঙ্গে কর্নেলের নিজের বক্তব্য হল, 'আসলে আমি একজন নেচারিস্ট...। প্রকৃতিতে অসীম রহস্য। তা-ই নিয়ে আমি নিজের পদ্ধতিতে মাথা ঘামাই। না, আমি বিজ্ঞানী নই। তবে মানুষও তো প্রকৃতির একটা অংশ। তাই কোথাও মানুষের জীবনে রহস্যময়, কিছু দৈবাৎ ঘটে গেলে আমি নাক গলাই।' (দ্রষ্টব্য- 'খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত')।

নেচারিস্ট বলেই কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের কাহিনির খুনজখম, হেঁয়ালি, রহস্য, ভূত-প্রেত প্রভৃতির মধ্যে দেখা যায় দুষ্প্রাপ্য লাল ঘুঘু, নীল সারস, উডডাক, সেক্রেটারি বার্ড, নানারকম প্রজাপতি, ক্যাকটাস, ফুল প্রভৃতির অনুষঙ্গ।

কর্নেল বৃদ্ধ হয়েছেন। বিশালদেহী মানুষটির মাথাজোড়া টাক আর মুখ ভরতি লম্বা সাদা দাড়ি-গোঁফ। অনেকটা সান্টা ক্লজের মতো। জয়ন্ত মাঝে মাঝে মজা করে বলে ফাদার ক্রিসমাস। কিন্তু বয়সে বুড়ো হলে কী হবে,

গায়ের জোর অনেক জোয়ানের থেকেও বেশি। আর বুদ্ধির জোর বেশি সকলের থেকে। কোনও রহস্যের সন্ধানে গিয়ে ডাকবাংলো, সেচবাংলো বা বন দফতরের বাংলোয় থাকার সময়ও বেলা অবধি ঘুমিয়ে ওঠা জয়ন্ত দেখে সেই কোন ভোরে বেরিয়ে মর্নিং ওয়াক সেরে ফিরছেন কর্নেল। মাথায় শীতে মাঙ্কি-ক্যাপ আর গরমে টাক-ঢাকা টুপি, গায়ে ওভারকোট বা হালকা জ্যাকেট, হাতে ছড়ি, গলায় ক্যামেরা, পিঠের ব্যাগ থেকে উঁচিয়ে থাকা প্রজাপতি ধরার ফোল্ডিং জালের হাতল, আর দাড়িতে শুকনো পাতা, কাঠকুটো, পোকামাকড়।

বিদেশি সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাসে বৃদ্ধ ডিটেকটিভ নতুন কোনও বিষয় নয়। আগাথা ক্রিস্টির এরকুল পোয়ারো প্রথম থেকেই ষাটোর্ধ্ব অবসরপ্রাপ্ত। শার্লক হোমসও বুড়ো বয়সে বিস্তর রহস্য সমাধান করেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের গোয়েন্দা পাঁচকড়ি দে-র সৃষ্টি দেবেন্দ্র বিজয়কেও দেখা যেত নাতির সঙ্গে শিশুসুলভ ছেলেখেলায় মেতে থাকতে। শরদিন্দুর নিজের বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠেছিল ব্যোমকেশ বক্সীর বয়সও। কিন্তু যে যুগে সিরাজ সাহেব কর্নেলের কাহিনি লিখতে আরম্ভ করলেন, সে যুগে বৃদ্ধ গোয়েন্দার আবির্ভাব ঘটানো ছিল চরম সাহসিক এবং নতুন এক পদক্ষেপ।

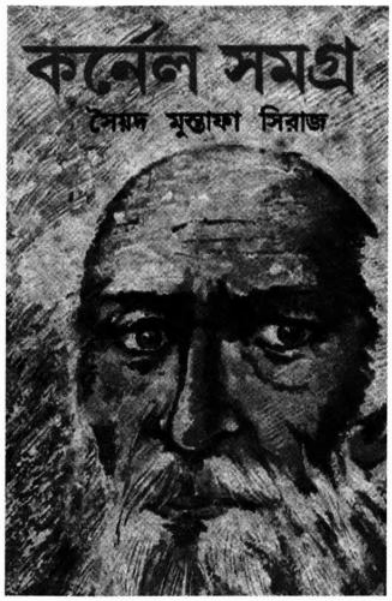

আগাথা ক্রিস্টি বহু সময়ে আপশোস করেছেন এরকুল পোয়ারো এবং মিস মার্পলকে একেবারে শুরুর থেকেই বয়স্ক হিসেবে পাঠকের কাছে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু সেই অসুবিধা সিরাজ সাহেবের হয়নি। কর্নেল, ষষ্ঠীচরণ, জয়ন্ত সেই ১৯৬৯ সাল থেকে ২০১২ পর্যন্ত একই রকম থেকে গিয়েছেন। তাঁদের বয়স বাড়ানোর প্রয়োজন হয়নি লেখকের।

দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছরে কর্নেলকে নিয়ে কত যে উপন্যাস, বড়গল্প, ছোটগল্প, নভেলেট ইত্যাদি লেখা হয়েছে, তার সঠিক হিসেব কোনও প্রকাশক বা সম্পাদক তো বটেই, সম্ভবত সিরাজ সাহেব নিজেও দিতে পারতেন না। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এই কাহিনিগুলির কোনও একটির ঘটনার রেশ দেখা যেত না অন্য কোনও কাহিনিতে। শুধু কর্নেল নিজে, জয়ন্ত আর ষষ্ঠীর সঙ্গে কিছু কিছু গল্প-উপন্যাসে দেখা যেত প্রাইভেট ডিটেকটিভ কৃতান্তকুমার হালদার এবং লালবাজারের ডিসিডিডি অরিজিৎ লাহিড়ীকে। অবশ্য এমন গল্পও আছে, যেখানে জয়ন্তও নেই, ষষ্ঠীও নেই। সেখানে কর্নেল একাই একশো।

কাহিনির সংখ্যা এবং রহস্যের বৈচিত্রের সঙ্গে কাহিনির আঙ্গিকও লেখককে বদলাতে হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কোনান ডয়েল প্রবর্তিত নিয়মে গল্পের কথক, কর্নেলের ওয়াটসন, দৈনিক সত্যসেবক কাগজের স্টার রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরী; এমন অনেক কর্নেল কাহিনি আছে, যেখানে জয়ন্তর উপস্থিতি সত্ত্বেও পাঠককে গল্প শুনিয়েছেন লেখক বা কাহিনির অন্য কোনও চরিত্র, কিংবা কর্নেল স্বয়ং। কিছু কাহিনির বক্তা কর্নেল নিজেই। অনেকগুলি উপন্যাসে দেখা যায়, কিছু অংশ লেখকের জবানীতে আর অপর অংশ জয়ন্তর। একইভাবে আংশিক লেখকের কথা আর আংশিক কর্নেলের ভাষ্যেও কয়েকটি উপন্যাস বা বড়গল্প রচিত হয়েছে। খুব কম কয়েকটি উপন্যাস আছে, যেমন 'বিপজ্জনক ১১' (অন্য নাম 'এগারোর অঙ্ক'), সেখানে এক-একটি পরিচ্ছেদের বক্তা কাহিনির এক-একটি চরিত্র, যার মধ্যে কর্নেল এবং জয়ন্তও আছেন একাধিক পরিচ্ছেদের কথক হিসেবে।

কর্নেল-কাহিনির আরও এক বিশেষত্ব হল, মুস্তাফা সিরাজ সমানতালে কর্নেলকে নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন বড়দের এবং ছোটদের জন্য। মনে হয় কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ছাড়া আর কোনও চরিত্র নেই, যাঁকে নিয়ে লেখা গল্প বা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে কিশোরপাঠ্য 'আনন্দমেলা' পত্রিকায় এবং প্রাপ্তবয়স্কদের পত্রিকা 'আনন্দলোক'-এ। একই লেখক ছোটদের এবং বড়দের পাঠ্য গোয়েন্দা কাহিনি লিখেছেন— এমন উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে অনেক আছে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন বয়সের পাঠকের জন্য আলাদা গোয়েন্দা চরিত্র বানিয়ে নিয়েছেন তাঁরা। যেমন, সমরেশ বসুর লেখা কিশোরপাঠ্য গোয়েন্দা গল্পের নায়ক গোগোল আর বড়দের জন্য গোয়েন্দা হলেন অশোক ঠাকুর। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কিশোরদের জন্য গড়ে নিলেন গোয়েন্দা বরদাচরণকে আর প্রাপ্তবয়স্কদের পাঠ্য উপন্যাসের গোয়েন্দার নাম রাখলেন শবর দাশগুপ্ত। এ কথা মানতেই হবে যে কর্নেলকে নিয়ে লেখা বয়স্কপাঠ্য কাহিনির সংখ্যা ছোটদের জন্য লেখা গল্প বা উপন্যাসের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু সাহিত্যের গোয়েন্দা হিসেবে কর্নেল কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের কাছেও প্রবলভাবে প্রিয়।

একই সঙ্গে আবার এও বলতে হয় যে ছোটদের জন্য লেখা কর্নেলের গল্প-উপন্যাসে এমন কিছু বিষয় কখনও চলে এসেছে, যেগুলির গোয়েন্দা কাহিনির চিরাচরিত নিয়মের পরিপন্থী। এই বিষয়গুলিকে বলা যেতে পারে অলৌকিক কাহিনি বা সায়েন্স ফিকশনের উপাদান। এই ধরনের কাহিনির উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে 'দুঃস্বপ্নের দ্বীপ', 'সবুজ বনের ভয়ংকর', 'কালো বাকসের রহস্য', 'কোদণ্ডের টংকার', 'ওজরাকের পাঞ্জা' প্রভৃতি কাহিনির নাম। কিন্তু কর্নেল যেহেতু প্রকৃতিবিদ এবং গল্পগুলি যেহেতু ছোটদের জন্য লেখা, এবং সুখপাঠ্য, তাই এই অনিয়ম মেনে নিতে পাঠকের অসুবিধা হয় না।

কর্নেলের সহচর এবং অনেকগুলি গল্প-উপন্যাসের বক্তা জয়ন্ত চৌধুরী কিন্তু কর্নেলের মতো বৃদ্ধ নয়। 'অ্যাংগ্রি ইয়াং ম্যান' বলা যায় তাঁকে। তাঁর একটি লাইসেন্সড রিভলভারও আছে।

একবার এক আন্তর্জাতিক গুপ্তচর চক্রর সঙ্গে প্রভাবশালী এক

কাহিনির সংখ্যা এবং রহস্যের সঙ্গে কাহিনির আঙ্গিকও লেখককে বদলাতে হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কোনান ডয়েল প্রবর্তিত নিয়মে গল্পের কথক, কর্নেলের ওয়াটসন, দৈনিক সত্যসেবক কাগজের স্টার রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরী; এমন অনেক কর্নেল কাহিনি আছে, যেখানে জয়ন্তর উপস্থিতি সত্ত্বেও পাঠককে গল্প শুনিয়েছেন লেখক।

রাজনৈতিক নেতার যোগাযোগের খবর জেনে ফেলে তাদের রোষে পড়ে জয়ন্ত। খুন হয়ে যায় তার সঙ্গী ফোটোগ্রাফার। পুলিশ তদন্ত শুরু করে বিশেষ সুবিধা করতে পারছিল না। শেষে কর্নেলের সহায়তায় ধরা পড়ে গুপ্তচর চক্রর পাণ্ডারা এবং সেই নেতা, তখনই জয়ন্তর সঙ্গে কর্নেলের আলাপ। কর্নেলের বুদ্ধিমত্তা দেখে চমৎকৃত হয় জয়ন্ত। পরে ধীরে ধীরে তাঁর ন্যাওটা হয়ে ওঠে। (দ্রষ্টব্য- সুন্দর বিভীষিকা)।

কর্নেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের হয়ে বার্মা এবং আফ্রিকার রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন। গেরিলা যোদ্ধাদের একটি দলের নেতা ছিলেন তিনি। বার্মায় ১৯৪২ সালে যুদ্ধের সময়ে একটি বর্মি গ্রামে ছদ্মবেশ নিয়ে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন জাপানিদের গতিবিধি সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহের জন্য। কিন্তু তিনি যে কীভাবে গোয়েন্দা হয়ে উঠলেন, সে কথা জয়ন্তকে কখনও বলেননি। প্রশ্ন করলে রহস্যময় হেসেছেন শুধু। তবে জয়ন্তর অনুমান, প্রকৃতিবিদ হিসেবে পোকামাকড়ের আচরণ পর্যবেক্ষণ কিংবা দুর্লভ প্রজাতির পাখি বা প্রজাপতির পিছনে ঘুরে তাঁকে গোয়েন্দাগিরিই করতে হত। সেভাবেই তিনি গোয়েন্দা হয়ে উঠেছিলেন। ঠিক এই ধরনের কথা বলেছিলেন বাস্তবের এক প্রকৃতিবিদ। 'গোয়েন্দা কাহিনি সবাই লিখতে পারে না। কিন্তু অরণ্যে গোয়েন্দাগিরির ঘটনা যে সঙ্কলন করে ফেলতে পারে যদি অরণ্যে পথ চলার সময়ে রাস্তাটি ছাড়া আরও অন্য কিছু দেখার মতো চোখ তার থাকে।' বক্তার নাম জিম করবেট। (দ্রষ্টব্য- 'জাঙ্গল লোর', অষ্টম অধ্যায়)।

সত্যজিৎ রায় ফেলুদা সিরিজের কাহিনিতে বাস্তব পটভূমিতে কাল্পনিক চরিত্রদের নিয়ে গল্প লেখার ধারা প্রচলন করেছিলেন ছয়ের দশকের প্রথমার্ধে। গোয়েন্দা, তার সহকারী, অপরাধী, বা অন্যান্য চরিত্র এই কাহিনিমালায় যেসব রাস্তাঘাটে বিচরণ করতেন, যে হোটেলে থাকতেন, যে রেস্তরাঁয় খেতেন, যে দিকচিহ্নগুলির কাছাকাছি আসতেন, তাদের বর্ণনা প্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলে যেত বাস্তবের জায়গাগুলির সঙ্গে। এই ধারা অনুসরণ করতে শুরু করেন সাত ও আটের দশকের অধিকাংশ লেখক। এবং এই ধারা এখনও অনুসৃত হয়। কিন্তু কয়েকটি গল্পে পার্ক স্ট্রিট, ইলিয়ট রোড, নিউ মার্কেট, চৌরঙ্গি প্রভৃতি কলকাতার কয়েকটি এলাকার নাম ছাড়া এই রীতি কর্নেলের গল্প-উপন্যাসে খুব একটা গ্রহণ করেননি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। তিনি প্রয়োজনমতো গড়ে নিতেন বনপাহাড়ে ঘেরা সেতাপগঞ্জ, বরমডিহি, ভৈরবগড়, চিকনডিহি, ডমরুনাথ, ভীমজোলা প্রভৃতি প্রত্যন্ত জনপদ; কিংবা নীলাপুরম বা চন্দনপুর-অন-সি-র মতো সৈকত শহর, আর ধারিয়া ফলস বা রিস্তা স্কি ক্যাম্পের মতো বিউটি স্পট।

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার সঠিক অর্থে আর্মচেয়ার ডিটেকটিভ নন। যদিও তিনি কোনও লিপি বা বিশেষ বস্তু ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে নিরীক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনমতো ঘটনাপরম্পরা এবং সূত্র মনে মনে সাজিয়ে নিয়ে ডিডাকশন পদ্ধতিতে রহস্য ভেদ করেন অনেক সময়ে। অথচ সিগারেটের ছাই দেখে ব্র্যান্ড বলে দেওয়া, বা গাড়ির চাকার দাগ দেখে টায়ার কোম্পানির নাম বলে দেওয়া কিংবা সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনে পায়ের মালিকের উচ্চতা অনুমান করে নেওয়া তাঁর ধাতে নেই। তিনি হেঁয়ালি সমাধান করে লুকোনো জিনিস খুঁজে বার করেন। সমাধান করেন গোপন রেষারেষি বা প্রতিহিংসার ফলস্বরূপ ঘটে যাওয়া হত্যার রহস্য। আবার এই নীলাদ্রি সরকারই পুলিশকে সাহায্য করেন আন্তর্জাতিক চোরাচালানকারী বা বিদেশি গুপ্তচর প্রভৃতিদের চক্রান্ত জাল চূর্ণ করতে। কর্নেল সরকারের অনুষঙ্গে যেমন দেখা যায় ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরবঙ্গের অরণ্য মেখলা অঞ্চল, তেমনই দেখা যায় মুর্শিদাবাদের প্রাচীন কবরখানা বা শহরের ভিড় থেকে বহু দূরের কোনও পোড়ো রাজবাড়ি বা ভাঙা মন্দির; আবার তাঁর অনুষঙ্গে কখনও চলে আসে পার্ক স্ট্রিট এলাকার আলো-আঁধারিতে ঘেরা পানশালা, কলকাতার অভিজাত নাইটক্লাব, সন্দেহজনক এসকর্ট সার্ভিস এজেন্সি, কিংবা শহরের বড় হোটেল। কাহিনির প্রয়োজনে লেখককে গড়ে নিতে হয়েছিল মুনলাইট বার, গুড ইভনিং ক্লাব বা কন্টিনেন্টল হোটেলের মতো বিশেষ পটভূমি। এই পটভূমিতে বিচরণের সময়ে আবার কর্নেলকে মনে হয় পুরোদস্তুর হার্ড-বয়েলড ডিটেকটিভ। কর্নেল থাকেন কলকাতার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অধ্যুষিত এলাকা ইলিয়ট রোডে। তাঁর হাবভাব সাহেবি। 'কর্নেল সমগ্র'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছিলেন যে কর্নেলের আচার-ব্যবহার তাঁর মনে একজন খ্রিস্টানের আদর্শ বহাল রেখেছিল। অবশ্য পরে তিনি মনে করেন কর্নেলের মতো চরিত্রের বিশেষ কোনও ধর্মপরিচয়ের দরকার হয় না। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করা যায় যে, কর্নেলের বহু কাহিনিতে অনেক রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে কোনও কবরখানায়। অবশ্য সে কবরখানা মুসলিম বা খ্রিস্টান দু'ধর্মেরই হতে পারে। এমন দেখা গিয়েছে, 'ছায়া পড়ে', 'স্বর্গের বাহন', 'নবাবী মোহর', 'কাগজে রক্তের দাগ', 'অন্ধ বিভীষিকা' প্রভৃতি উপন্যাসে।

আরও একটি বিষয়, যা আধুনিককালের গোয়েন্দা কাহিনিতে প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে, হেঁয়ালির সমাধান কর্নেলের অনেক কাহিনির বিষয়বস্তু। গোয়েন্দা গল্পে ব্যবহৃত হেঁয়ালি কোনও প্রচলিত বা জনপ্রিয় হেঁয়ালি হয়

কর্নেলের প্রথম কাহিনির নাম 'ছায়া পড়ে'। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায়। ১৯৬৯ সালে। শেষ উপন্যাস 'রাজবাড়ির কুণ্ডল রহস্য' ১৪২০ বঙ্গাব্দ বা ২০১২ সালের শারদীয়া 'নবকল্লোল'-এ প্রকাশিত হয়। একেবারে শুরুতে জয়ন্ত চৌধুরীর চরিত্রটি ছিল না। পরে, এক গল্প-বলিয়ে চরিত্রের জয়ন্তকে সৃষ্টি করেন লেখক।

না। এগুলি গল্পের জন্য আলাদা করে তৈরি করতে হয় লেখককে। আর হেঁয়ালি এভাবে তৈরি করা যে কখনও হেঁয়ালি সমাধান করার চাইতে কঠিনতর হয়ে উঠতে পারে, সে কথা বুদ্ধিমান মানুষ জানেন। 'স্বস্তিকা রহস্য', 'সিংহগড়ের কিচনি রহস্য', 'হিকরি ডিকরি ডক রহস্য', 'কাগজে রক্তের দাগ', 'ভূতুড়ে লাশ', 'নীচে নামো বাঁয়ে ঘোরো', 'অলক্ষ্মীর গয়না', 'বরফধঝ কচটতপ' প্রভৃতি উপন্যাসে কর্নেলকে হেঁয়ালির সমাধান করে রহস্য ভেদ করতে হয়েছে।

কর্নেলের প্রথম কাহিনির নাম 'ছায়া পড়ে'। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায়। ১৯৬৯ সালে। শেষ উপন্যাস 'রাজবাড়ির কুণ্ডল রহস্য' ১৪২০ বঙ্গাব্দ বা ২০১২ সালের শারদীয়া 'নবকল্লোল'-এ প্রকাশিত হয়। একেবারে শুরুতে জয়ন্ত চৌধুরীর চরিত্রটি ছিল না। পরে, এক গল্প-বলিয়ে চরিত্রের প্রয়োজনে জয়ন্ত নামক ওয়াটসনকে সৃষ্টি করেন লেখক। কর্নেল কাহিনির আর এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র প্রাইভেট ডিটেকটিভ কৃতান্তকুমার বা কে কে হালদার। ইনি চৌত্রিশ বছর পুলিশে চাকরি করে রিটায়ার করার পর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলে পসার শুরু করেন। গণেশ অ্যাভিনিউয়ের এক উঁচু বাড়ির ওপরতলায় তাঁর অফিস। দুর্জয় সাহসের অধিকারী, দশাসই চেহারার

মানুষটিকে এককথায় বলা যায় 'ডেয়ারডেভিল ক্যারেকটার'। ঘন ঘন নস্যি নেন এবং পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে কথা বলেন হালদার মশাই।

৭ অগাস্ট ২০১১ তারিখের 'সকালবেলা' দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে সিরাজ সাহেব জানিয়েছিলেন, তিনি হালদার মশাইয়ের চরিত্রটি গড়েছিলেন ১৯৫৯-৬০ নাগাদ দেখা কান্দি থানার মেজবাবু মহেন্দ্র ঘোষ দস্তিদারের অবিকল অনুকরণে। হালদার মশাই মজাদার চরিত্র। অনেকটা টিনটিনের গল্পের মানিকজোড় ডিটেকটিভ থমসন অ্যান্ড থম্পসনের মতো। তবে তাদের মতো বোকা নন কে কে হালদার। কর্নেলকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করেন তিনি। বলেন, কর্নেল সাহেবের টাকের নীচে আছে কোটি টাকার 'ব্র্যান'।

একবার কোনও বাস্তবের সাংবাদিক কোনও সংবাদপত্রে লিখেছিলেন, হালদার মশাই হলেন সত্যজিৎ রায়ের জটায়ু চরিত্রের নকল। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে সিরাজ সাহেব হালদার মশাইয়ের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন, 'জটায়ু ভদ্রলোক আমার মতো চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছেন? প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলছেন আমার মতো? ওনার লাইসেন্সড ফায়ার আর্মস আছে? উনি আমার মতো বনবাদাড়ে রাত্রিবাস করছেন? তাঁরে কেউ আইষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধছে? মুখে টেপ সাঁটছে? উনি ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন করছেন?...' এই প্রসঙ্গে জয়ন্ত বলে, 'জটায়ু একটা প্যাসিভ ক্যারেকটার। আর হালদার মশাই অ্যাক্টিভ ক্যারেকটার।' (দ্রষ্টব্য- ম্যানিকিন রহস্য)।

৩৭/১, গোরাচাঁদ রোড
কলকাতা- ১৪
ফোন-২৪৪-৬৩৯৫
২৭/৩/৯৭

শ্রীপ্রসেনজিৎ দাশুগুপ্ত
প্রীতিভাজনেষু,

আপনার মূল্যবান চিঠিটির উত্তর দিতে বড্ড বেশি দেরি হয়ে গেল। এ জন্য আশা করি, কিছু মনে করবেন না। শারীরিক এবং পারিবারিক নানা ঝামেলা, তাছাড়া স্বভাবগত আলস্য ইত্যাদিই এর কারণ। আপনার প্রশ্নগুলি যথার্থ! আসলে ষাটোর্ধ্ব বয়সে আমি আর তত কর্মক্ষম নই। ফলে 'কর্নেল সমগ্র' প্রকাশে যে ধরনের যত্ন নেওয়া উচিত ছিল, সম্ভব হয়নি। দুঃখের বিষয় এ দেশে প্রকাশকদের কোনো যোগ্য সম্পাদক রাখার রীতি নেই। সম্পাদক থাকলে তিনিই সবকিছু আপনার এবং আমার অভিপ্রায় অনুসারে করে দিতেন। একটি, দু'টি উপন্যাসের নাম বদলাতে হয়েছে প্রকাশকের অনুরোধে। কারণ বই দুটি বাজারে নাকি বহুল প্রচারিত। যাই হোক, তরুণ বয়সে আমিও বিদেশি গোয়েন্দা-রহস্য-রোমাঞ্চের পোকা ছিলাম। তাই সচেতন চেষ্টার বিরুদ্ধেও অবচেতনা থেকে কোনো বিদেশি গল্পের বা গোয়েন্দার ছাপ কোথাও পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। কিছু গল্প-উপন্যাস শারদীয় পত্রিকার জন্য লেখা। ফলে তাড়াহুড়ো হয়েছিল এবং বই আকারে প্রকাশের সময় নতুন করে লেখার সময় পাইনি। এ দেশে প্রকাশনার বাজার লেখকদের— বিশেষ করে যাঁরা বেশি লেখেন, তাঁদের সময় দেয় না। 'ছায়া পড়ে' একেবারে শেষ খণ্ডে দেওয়ার ইচ্ছা আছে। একটা কথা জানানো উচিত। গোয়েন্দা-রহস্য লেখা আমার দ্বিতীয় হাতের কাজ। যখন অন্য কিছু লিখতে পারি না, তখন স্রেফ বিনোদনের জন্য এসব লিখি। আপনি কর্নেলভক্ত। এটা আমার পক্ষে গৌরবের। অর্থাৎ বোঝা যায়, হয়তো আমি ব্যর্থ হইনি।

প্রীতিসহ— সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

হালদার মশাইয়ের সঙ্গে জটায়ুর তফাত অনেকই। লেখকের কথায় জানা যায়, তিনি হালদার মশাইকে এনেছিলেন রহস্যের জটকে আপাতদৃষ্টিতে জটিলতর করতে। তিনি ছিলেন লেখকের রিলিফ। সুকুমার সেন 'ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি' গ্রন্থে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সৃষ্টি করা জয়ন্ত-মানিক-সুন্দরবাবুকে নিয়ে গঠিত যে ত্রিশূল ডিটেকটিভের কথা বলেছিলেন, ফেলু-তোপসে-জটায়ু অথবা কর্নেল-জয়ন্ত-হালদার মশাই কিন্তু আদতে সেই ত্রিশূল ডিটেকটিভেরই বিভিন্ন রূপ।

কোনান ডয়েল যেমন শার্লক হোমসের চরিত্রটি গড়েছিলেন তাঁর শিক্ষক ড. বেল-এর আদলে, কিংবা যেমন অনেকে মনে করেন ইয়ান ফ্লেমিং জেমস বন্ডকে বানিয়েছিলেন যুগোস্লাভ গুপ্তচর ডুস্কো পপোভ-এর মতো করে, তেমনই কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের চরিত্রটি সিরাজ সাহেব নির্মাণ করেন ১৯৫৬ সালে বিয়ের পর মুর্শিদাবাদের লালবাগে দেখা এক ট্যুরিস্টের মতো করে। কোনান ডয়েল বা ইয়ান ফ্লেমিং ড. বেল বা পপোভকে যতখানি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, মুস্তাফা সিরাজের পক্ষে ওই পর্যটককে তেমন কাছ থেকে দেখার সুযোগ ছিল না। ফলে লোকটির শারিরীক বিশেষত্বগুলি ছাড়া আর কিছু কর্নেলের ওপর আরোপ করতে পারেননি তিনি। অতএব ধরে নেওয়া যায়, কর্নেলের যাবতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লেখকের নিজস্ব কল্পনার ফসল। 'অলীক মানুষ', 'নিশিমৃগয়া', 'রাণীর ঘাটের বৃত্তান্ত', 'কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি', 'তৃণভূমি' প্রভৃতি উপন্যাস, 'তরঙ্গিণীর চোখ', 'ভালবাসা ও ডাউন ট্রেন', 'উড়ো পাখির ছায়া' প্রভৃতি গল্পের লেখক গোয়েন্দা কাহিনি লিখতেন মগজ তাজা রাখার জন্য। এক ব্যক্তিগত পত্রালাপে এই প্রাবন্ধিককে লেখক জানিয়েছিলেন, 'গোয়েন্দা- রহস্য লেখা আমার দ্বিতীয় হাতের কাজ। যখন আর কিছু লিখতে পারি না, তখন স্রেফ বিনোদনের জন্য এসব লিখি।'

'গোয়েন্দা রহস্য' লেখায় শুধু লেখকেরই বিনোদন হয়নি, হয়েছিল তাঁর লেখার হাজার-হাজার পাঠক-পাঠিকারও। 'কর্নেল সমগ্র'র সম্পাদনাবিহীন অযত্নের প্রকাশন যে তাঁকে খুশি করতে পারেনি, সে কথাও তিনি ব্যক্ত করেছিলেন পূর্বোক্ত চিঠিতে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ যে শুধুমাত্র গোয়েন্দা বা রহস্যকাহিনির লেখক নন, তিনি এক পুরোদস্তুর এবং বিদগ্ধ কথাসাহিত্যিক, সে কথা বোঝা যায় রহস্যগল্পের নায়ক এবং খলনায়কদের বিচরণ করা অন্ধকার জগতের সঙ্গে পাখপাখালি, কীটপতঙ্গ আর অর্কিড-ক্যাকটাস নিয়ে তৈরি প্রকৃতির এক সুন্দর অংশকে তাঁর অবলীলায় মিলিয়ে দেওয়ায়। এক অসাধারণ মানবিক দিক কর্নেলের চরিত্রে আরোপ করে কর্নেলকে তিনি পরিণত করেন নিজের দ্বিতীয় সত্তায়। নেচারিস্ট কর্নেল অজস্র খুনের ঘটনার রহস্য ভেদ করলেও ব্যথিত হন মৃত্যুর সান্নিধ্যে। সখেদে বলেন, 'এটা আমার ভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য...। যেখানে যাই নারদের ঢেঁকির মতন একটা-না-একটা ডেড-বডি আমার বাহন হয়ে ওঠে, হরিবল জয়ন্ত, হরিবল। যেন এক ইটারনাল মার্ডারার আমার পিছনে সবসময় ওঁৎ পেতে ঘুরছে।' (দ্রষ্টব্য- 'প্ল্যানচেট রহস্য')।

মাথা থেকে টুপি খুলে, ওভারকোট হুকে টাঙিয়ে, পিঠের কিটব্যাগ নামিয়ে রেখে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার লেখকের সঙ্গে অন্য এক জগতে চলে গিয়েছেন সেই ইটারনাল মার্ডারারকে পিছনে ফেলে ২০১২ সালের চৌঠা সেপ্টেম্বর। হয়তো মেতে উঠেছেন সেখানকার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে। এই জগতে এখনও অপরাধী অপরাধ করে, প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়, পাখি এসে বসে গাছের ডালে, অর্কিড ফোটে নানা রঙের, জন্ম নেয় বিচিত্র চেহারার ক্যাকটাস। কিন্তু কর্নেল আর তাদের খবর রাখেন না।

সেইসব দিন আর নেই!

আবির এবার ফেলুদা

এতদিন তিনি অজিতকে নিয়ে রহস্য ভেদ করতেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সীর চরিত্রে তাঁর অভিনয় তাক লাগিয়ে দিয়েছে বাংলার দর্শকদের। এবার তিনি পোশাক বদলালেন। ব্যোমকেশের বদলে এবার তিনি ফেলুদা। তাঁকে নিয়ে ছবি করছেন স্বয়ং সন্দীপ রায়। লিখছেন, **সৌমিতা বিশ্বাস**

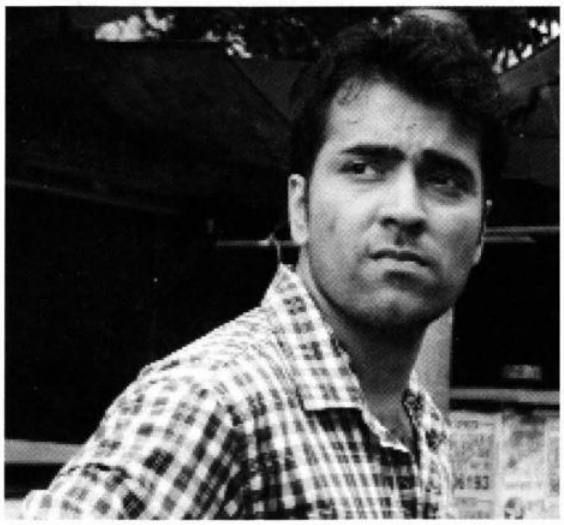

■ ব্যোমকেশ, আবির, এখন ফেলুদা— এই ব্যাপারটা নিয়ে খুলে দর্শকদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তাঁরা খুব উচ্ছ্বসিত, এই ব্যাপারে তোমার কী প্রতিক্রিয়া?

আবির চট্টোপাধ্যায়- দেখো, মুশকিল হচ্ছে যে আমি ফেলুদা নিয়ে একটা কথাও বলতে পারব না, অন দ্য কনট্রাক্ট-এ লেখা আছে। প্রযোজকরা যে প্রেস রিলিজটা করবেন, তার আগে আমি ফেলুদা নিয়ে একটা কথাও বলতে পারব না।

■ আচ্ছা, এটা বলতে নিশ্চয়ই অসুবিধে নেই যে শরদিন্দুর গোয়েন্দা থেকে সত্যজিতের গোয়েন্দার কতটা তফাত?

আবির চট্টোপাধ্যায়- এটা বলা যায়। দেখো, সবচেয়ে বড় হল সময়ের তফাত। আর ফেলুদা শুরু হয়েছিল কিশোর উপন্যাস হিসেবে। কাজেই সেই গল্প, তার চরিত্রায়ণ, তার ক্লাইম্যাক্স প্যাটার্ন, সেগুলো অনেকটাই কিশোর উপন্যাসের মতো করে উপযুক্ত করে লেখা। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ব্যোমকেশ কখনওই কিশোর উপন্যাস ছিল না। তার চরিত্রায়ণ, ক্রাইম বা ক্রাইমের যে ভয়ঙ্করতা, তাদের বিষয় এসেছে। মানুষের সম্পর্কে যৌনতা, ঈর্ষা— এগুলো অনেক বেশিভাবে এসেছে। দুটো আলাদা সময় ও আলাদা প্রেক্ষাপট। এই তফাতগুলো রয়েছে।

■ একজন অভিনেতার কাছে এতগুলো চরিত্র, হিরো থেকে নানারকম প্রধান চরিত্র, দু'জন জনপ্রিয় বাঙালি গোয়েন্দা চরিত্র পেয়েছ। ওটা একজন অভিনেতার বেশ লোভনীয়। এতে তোমার ফিলিংসটা কেমন?

আবির চট্টোপাধ্যায়- আমার কাছে এটা খুব সৌভাগ্যের যে এতরকম চরিত্রে আমাকে অভিনয় করার সুযোগ দিয়েছেন পরিচালক-প্রযোজকরা। যার জন্য একজন অভিনেতা হিসেবে আমি নিজেকে এক্সপ্লোর করতে পেরেছি। কোনও একটা ইমেজে আটকে পড়ছি না। সেটা আমার সৌভাগ্যের। সবসময় নিজেকে চ্যালেঞ্জ করতে হচ্ছে। চরিত্রটা কীভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়— এটা নিয়ে।

■ কখনও কারও কাছে কোনও চরিত্রের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করতে হয়নি?

আবির চট্টোপাধ্যায়- না, সেরকম হয়নি। আমাকেই তাঁরা ভরসা করে চরিত্রগুলো দিয়েছেন। সেদিক থেকে আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

■ আচ্ছা, অনেক দর্শকের কাছে এটা শুনেছি যে সুজয় ঘোষের ব্যোমকেশ দেখে অনেক দর্শক এমন মন্তব্য করেছেন যে যতটা প্রত্যাশা করা গিয়েছিল হোর্ডিং দেখে বা প্রোমো দেখে, অনেকের মতে সুজয় নাকি সেটা পূরণ করতে পারেননি। তুমি আগে ব্যোমকেশ করেছ, এই ব্যোমকেশের চোখে সুজয়ের ব্যোমকেশ কেমন?

আবির চট্টোপাধ্যায়- দেখো, এই ছবিটা নিয়ে এখন আর আলোচনা করে লাভ নেই। এটা ঋতুদার শেষ ছবি। তাঁর অসময়ে চলে যাওয়া খুব পেনফুল। ওই ছবি বা চরিত্রায়ণ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে, কোনও না কোনওভাবে ঋতুদার কথা চলে আসবে। তাঁকে আমরা সকলেই খুব সম্মান করি। সেটা আমরা কেউই করতে চাই না। একটাই খুব ব্যথার জায়গা যে উনি খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। তাই ওই ছবিটা নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না। দর্শকরা একটা ছবি যেভাবে দেখেন বা প্রতিক্রিয়া দেন, সেটাই ছবির শেষ কথা। আমরা আর সেটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না।

■ ভবিষ্যতে কি তোমাকে আর ব্যোমকেশ হিসেবে দেখা যাবে?

আবির চট্টোপাধ্যায়- না, আর দেখা যাবে না। একটা ছবি আমার রেডি হয়ে আছে। সেই ছবিটা জানি না কবে রিলিজ করবে, দেখা যাক...

ফেলু মিত্তিরের এবিসিডি

অভিজিৎ সুকুল

এমনিতে দেখতে গেলে 'ফেলু' এমন এক নাম, যার সঙ্গে পাড়ার রকে বসে আড্ডা দেওয়া পটলা, ন্যাপলা বা গণেশের আলাদা করে কিছু তফাত করা যায় না। ফেলু নামের যে কোনও ছেলেকেই যেন আপনি ডেকে এনে হাতে ইলেকট্রিক বা টেলিফোনের বিল ধরিয়ে দিতে পারেন লাইনের ঝক্কি এড়ানোর জন্য। অথচ সেই ফেলুই যখন 'ফেলুদা' হয়ে যায়, তখনই যেন দেখা যায় হুডিনির ম্যাজিকের চমক! সফলতার চূড়ান্ত প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে সে। ফেলুদা মানেই ডিসিপ্লিন, ফেলুদা মানেই বরফ-ঠান্ডা মাথা। তুখড় ভিলেনদের চোখে চোখ রেখে সমানে টক্কর দেওয়া এক যুবক, যে কিনা আবার খুনসুটির ছলে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে তোপসের পিরিচ থেকে নিমেষে হাওয়া করে দিতে পারে লাড্ডুর পিস। এককথায়, ফেলুদা এমন এক মানুষ, বাঙালি যার মতো হতে চায়; কিন্তু পারে না। আর এটাই ফেলুদার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। আবার, অন্যভাবে দেখতে গেলে, ফেলুদা তো শুধু ফেলুদাই নয়। ফেলুদা সত্যজিৎও। সত্যজিৎ নিজেই বলেছিলেন যে তিনি সাহিত্যিক নন, 'সন্দেশ'-এর পাতা ভরানোর জন্য ফেলুদার জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু গল্পগুলি পড়তে থাকলেই পাঠক বুঝে যান যে ফেলুদা আসলে সত্যজিতেরই অলটার-ইগো। স্রষ্টার মতো ফেলুদাও এক 'রেনেসাঁ ব্যক্তিত্ব'। গত শতকের চার-পাঁচের দশকে এক মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে বড় হয়ে ওঠা এক ইশকুল মাস্টারের ছেলে, যে আসলে বাঙালির থেকেও বেশি বাঙালি। অথচ প্রজ্ঞা ও মানসিকতায় ভীষণ রকমের ইউরোপীয়। সত্যজিতের মতোই সে মনের জানালা খুলে রাখে, খোঁজ রাখে দুনিয়া জুড়ে ঘটে চলা নানা ঘটনার আর পুষ্টি ঘটায় মস্তিষ্কের। মনে রাখবেন, যুগটা কিন্তু ইন্টারনেটের ছিল না, ছিল না যখন খুশি গুগল খুলে বসে পড়ার অপশনও। যদিও ছিলেন ফেলুদার গুগল সিধুজ্যাঠা। সত্যজিতের সিনেমা যেমন দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ইউরোপ ও হলিউড প্রভাবিত, অথচ ভীষণভাবে ভারতীয়ও, ফেলুদার চরিত্রও যেন অনেকটা তেমনই। বাইরের ভালোর নির্যাসটুকুকে বাঙালি মূল্যবোধের সঙ্গে মিলিয়ে যে ছাঁচটা তৈরি হয়, তাতেই গড়া ফেলু মিত্তির, এমনকী সত্যজিতের আরেক সৃষ্টি শঙ্কুও। একটু খেয়াল করে দেখবেন, এঁরা দু'জনেই যে স্বরে কথা বলেন, যেভাবে চিন্তা করেন, বাংলা সাহিত্যের অন্য কোনও দাদাই কিন্তু সেভাবে কথা বলেন না। প্রকৃতপক্ষে, গড়পড়তা বাঙালিও যেন ঠিক এভাবে কথা বলেন না। অথচ ফেলুদা যেন ভীষণভাবে মিত্তির বাড়ির অন্য পাঁচটা ছেলের মতোই বাঙালি, তা সে যতই ভিজিটিং কার্ডে সাহেবি কেতায় 'প্রদোষ সি মিটার' লিখুক না কেন। রহস্যের প্যাঁচ, তার সমাধান আর মগজাস্ত্রের ব্যবহার—সেসব তো আছেই, যেমন থাকে অন্য গোয়েন্দা গল্পেও। ফেলুদার মধ্যে আছে আরও অনেক জিনিস, যা তাকে 'ফেলুদা' করে তুলেছে। যে ফেলুদা হারে না, হারতে পারে না।

কবজির ওপর অবধি গোটানো পাঞ্জাবির ওপর একটা শাল জড়িয়ে দুই

ফেলুদার প্রথম গল্প 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' বেরিয়েছিল সেই ১৯৬৫ সালে, আর শেষ গল্প 'ইন্দ্রজাল রহস্য' ১৯৯৫ সালে। অর্থাৎ কিনা আর এক বছর বাদেই পঞ্চাশে পা দেবেন গোয়েন্দাপ্রবর। এত বছরেও ফেলুদার জনপ্রিয়তা এতটুকুও টাল খায়নি। আজও ফেলুদার বই বেস্টসেলারের তালিকায় মাঝেমধ্যেই উঁকি দেয়। অরকুট, ফেসবুকে একাধিক গ্রুপে ফেলুদাকে নিয়ে চলে প্রবল চর্চা। 'ফেলুদা আসছে'— শহর জুড়ে এই পোস্টার পড়লেই গুটিগুটি পায়ে হলমুখী হওয়ার পরিকল্পনা ভাঁজে ভক্তদল। এক ফেলু বুড়ো হলে নতুন ফেলু কে হবে, সে নিয়ে জল্পনায় মাতে মিডিয়াকুল আর ফেলুর ফ্যানেরা, আজও। এমনকী সৌমিত্র, সব্যসাচীর জুতোয় পা গলাবার জন্য মুখিয়ে থাকেন নতুন নায়করাও। কারণ তাঁরাও জানেন, ফেলুদার নামের সঙ্গে নিজেকে জুড়তে পারা মানেই বাঙালির ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে যাওয়া। অথচ অসমাপ্ত লেখাগুলি বাদ দিলে সর্বসাকুল্যে ফেলুদার পূর্ণাঙ্গ লেখা মাত্র গোটা পঁয়ত্রিশেক। এই ক'টি গল্পেই (যেখানে ফেলুদার স্বঘোষিত গুরু শার্লক হোমসকে নিয়ে কোনান ডয়েল লিখেছিলেন চারটি উপন্যাস ও ৫৬টি ছোটগল্প; আরেক জনপ্রিয় গোয়েন্দা পোয়ারো মুখ দেখিয়েছিলেন ৩৩টি উপন্যাস ও পঞ্চাশের অধিক ছোটগল্পে) সত্যজিৎ ফেলুদাকে নিয়ে গিয়েছেন জনপ্রিয়তার এমন এক উচ্চতায়, যার কাছাকাছি খুব কম বাঙালি গোয়েন্দার পক্ষেই পৌঁছোনো সম্ভব হয়েছে।

আঙুলের ফাঁকে চারমিনার গুঁজে ফেলুদার ভুরু কোঁচকানো 'লুক' (সে আপনি সৌমিত্র চাটুজ্জেকেই ভাবুন বা সত্যজিতের ইলাস্ট্রেশন) বাংলার যে কোনও তরুণীর বুকে কাঁপন ধরানোর জন্য যথেষ্ট। আবার তেমনই প্যান্ট-শার্টে বা ব্লেজারেও ফেলুদাকে এতটাই স্মার্ট লাগে যে পুলক ঘোষাল তাকেই ফিল্মের হিরো হওয়ার প্রস্তাব দিয়ে বসেন। এরকম একজন লোকের যে একটা বড়সড় 'ফিমেল ফ্যান ফলোয়িং' থাকবে তা বলাই বাহুল্য। ফেলুদারও আছে, তা সে ফেলুদার গল্প যতই প্রায় নারী চরিত্র বর্জিত হোক না কেন! গড়পড়তা বাঙালির মতোই যখন-তখন বেড়াতে বেরিয়ে পড়ায়ও ফেলুদার সমস্যা নেই। শর্ট নোটিশে বেরিয়ে পড়ার জন্য দরকারি জিনিসপত্তর ফেলুদার ব্যাগে গোছানোই থাকে। আবার যে ফেলুদা খাওয়ার পর খয়ের ছাড়া মিঠে পান আয়েশ করে উপভোগ করে বা আর পাঁচটা বাঙালির মতোই যে নলেন গুড়ের সন্দেশ বা মিহিদানার ভক্ত, সেই অবলীলায় ফিরিয়ে দিতে পারে মোটা টাকা নিয়ে তদন্ত বন্ধ করার বা টিনটোরেটোর যিশুর ছবি বা শম্ভুচরণ বোসের ম্যানুস্ক্রিপ্ট বেহাত করবার অফার। ঘুষ খেতে অভ্যস্ত বাঙালি জীবনে এক উজ্জ্বল আপসহীন ব্যতিক্রম রজনী সেন রোডের এই বাসিন্দা। যেমন ব্যতিক্রমী তিনি সময়ের ব্যাপারেও। 'বাঙালির টাইম' ফেলুদার অভিধানে নেই। দশটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে ন'টা উনষাট মিনিটে পৌঁছে যাওয়াটাই যে দস্তুর, সেটা ওর মতো খুব কম বাঙালিই বোঝেন। গভীর রাত অবধি কাজ করেও ভোর-ভোর উঠে যোগব্যায়ামটা সেরে ফেলার রুটিনেও তাই অন্যথা হয় না। যে কোনও জটিল বিষয় সহজ করে বোঝাতেও ফেলুদার এক সহজাত দক্ষতা আছে। তোপসে যেমন বলেই ফেলে যে ইশকুলে পরীক্ষা দিতে মোটেই ভালো লাগে না, কিন্তু ফেলুদার কাছে যে পরীক্ষাটা দিতে হয়, সেটা সে উপভোগই করে। আর এমন শিক্ষকের সংস্পর্শে থাকার জন্য বাবার পূর্ণ সমর্থনও পায় সে। মা যখন তোপসের ইশকুল কামাইয়ের দোহাই দেন, বাবা তাই বলেন, 'ফেলুর মতো মাস্টার আছে কি সেই স্কুলে?' সত্যিই তো। 'সাদাসিধে মানুষের মন স্ট্রেট লাইনে চলে; প্যাঁচালো মন সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে, আবার পাগলের মন যে কখন কোন দিকে চলবে তা কেউ বলতে পারে না— একেবার জটিল জিয়োমেট্রি।' এত সহজে বুঝিয়ে বলতে পারার মতো মাস্টার কি আর ঘরে ঘরে মেলে? আমরা দেখি, মগনলালের মতো ধুরন্ধর অপরাধীর বাড়িতে চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে ফেলুদার বিবেকে বাধে না। অথচ সেই ফেলুদাকেই আবার দেখি তদন্তে অসুবিধা হবে জেনেও খোদ লন্ডনে বসে এক সাহেবের মুখের ওপর বলে দিচ্ছেন, 'তাহলে আপনার কাছ থেকে আর কোনও ইনফর্মেশন আমি চাই না। যেটুকু দিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ।' সাহেবের অপরাধ? তিনি এখনও ভারতীয়দের 'নিগার' ভাবেন। দেশের অপমানের সঙ্গে কোনওভাবেই আপস নয়। এই হলেন ফেলুদা। যিনি সিরিয়াস আলোচনার মাঝেও তোপসেকে হঠাৎ করে ধমকে ওঠেন, 'তুই যে একটু আগে জানালা দিয়ে থুক করে থুতু ফেললি— অবিশ্যি ফেলা উচিত নয়...' বলে। ভাগ্যিস পানের পিক আর গুটখার গ্রাফিতিতে ব্যস্ত এই শহরে ফেলুদা এখন আর নেই।

'বাঙালির টাইম' ফেলুদার অভিধানে নেই। দশটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে ন'টা উনষাট মিনিটে পৌঁছে যাওয়াটাই যে দস্তুর, সেটা ওর মতো খুব কম বাঙালিই বোঝেন। গভীর রাত অবধি কাজ করেও ভোর-ভোর উঠে যোগব্যায়ামটা সেরে ফেলার রুটিনেও তাই অন্যথা হয় না।

এবিসিডি, মানে এশিয়া'জ বেস্ট ক্রাইম ডিটেক্টর— জটায়ু-কৃত এই অনবদ্য নামকরণেই এককথায় ব্যাখ্যা করা যায় ফেলুদাকে। প্রদোষ মিত্তিরের এই অসামান্য কেরিয়ারের পেছনে আর যাঁদের অবদান অস্বীকার করা যায় না, তাঁরা হলেন তাঁর গল্পের খলনায়করা। মহাদেব চৌধুরী, বনবিহারীবাবু, নরেশ পাকড়াশী— এঁরা প্রত্যেকেই যেন এ বলে আমাকে দেখ তো ও বলে আমাকে। আর মগনলাল মেঘরাজ তো এতটাই 'জনপ্রিয়' যে একেবারে 'শোলে'র গব্বর সিং-এর সঙ্গে তুলনা টানা যেতে পারে। ফেলুদার ভিলেনেরা অনেকেই অত্যন্ত শিক্ষিত এবং ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী। সেই সঙ্গে বিচিত্র শখ তাঁদের। কেউ বাড়িতেই বানিয়ে ফেলেছেন আস্ত একখানা চিড়িয়াখানা তো কেউ আবার বানিয়েছেন দুষ্প্রাপ্য সব ঘড়ির মিউজিয়াম! কারও 'প্যাশন' পুরোনো দিনের ভ্রমণ কাহিনির পাণ্ডুলিপি তো কেউ আবার পরলোকচর্চা করেন তিব্বতি প্রথায়। অদ্ভুতুড়ে সব খেয়াল থাকলেও সত্যজিতের কলমের গুণে এঁদের প্রত্যেককেই বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র মনে হয়। আর সে জন্যই পাঠকও আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়ে ফেলুদার রহস্যে, বিচিত্র এই ভিলেনদের আসল স্বরূপ উদ্ঘাটনের সঙ্গী হতে। সেই সঙ্গে ফেলুদার রহস্যের পরতে পরতে জড়িয়ে পড়েছে জাহাঙ্গিরের স্বর্ণমুদ্রা, যমন্তকের মূর্তি, টিনটোরেটোর ছবি, নানাসাহেবের নওলাখা হার, আওরঙ্গজেবের আংটি, শেয়াল-দেবতা আনুবিস— বাঙালির ফ্যান্টাসির কত কিছুই। পাঠককে চুম্বকের মতো টেনে রাখে এগুলিও। তা বলে কি ফেলুদার মধ্যে নেগেটিভ কিছুই নেই? অবশ্যই আছে। ফেলুদার সবচেয়ে বড় শত্রু তিনি নিজেই। লীলা মজুমদার তাঁর 'ফেলুচাঁদ' প্রবন্ধে কী বলছেন শুনুন। 'ফেলুচাঁদ সারাক্ষণ বড় বেশি ফিটফাট, বড্ড (একেবারে শতকরা ১০০ ভাগ) সচেতন লোক। ৩৫টা গল্প-উপন্যাসে ফেলুদার গোটা গোয়েন্দা-জীবন জুড়ে, কোথাও লোকটার এক ঝিলিক বোকামির আঁচ খুঁজে পাই না। এক অতিমানবের মতই তিনি চির-অপরাজেয়! এমনকি তোপসেও আমার চেনা-জানা আর-পাঁচজন ওই বয়সের চৌকোস ছেলের চাইতে একদম আলাদা। একটু বেশি বিজ্ঞ, একটু বেশি সংযত।'

যে অতিমানবীয় ইমেজটা ফেলুদার 'ইউএসপি', সেটিই আবার ফেলুদার বিপক্ষেও গেছে কোনও কোনও সময়। সত্যজিতের যখন বয়স হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ শেষ দিকের ফেলু-কাহিনিগুলো যখন আর আগের মতো তেমন জমছে না, অথচ পাঠকের চাপে লেখা চালাতে বাধ্য হচ্ছেন সত্যজিৎ, তিনি নিজেই ফেলুদার মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন, 'গুনে দেখেছি ছাপ্পান্নখানা চিঠিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা।' কী কথা? না 'ফেলু মিত্তিরের মামলা আর তেমন জমাটি হচ্ছে না, জটায়ু আর তেমন হাসাতে পারছেন না, তপেশের বিবরণ বিবর্ণ হয়ে আসছে।' বাঙালি পাঠক ফেলুর সামান্যতম বিচ্যুতি মেনে নিতেও রাজি নন। ফেলুদা তেমনই এক স্বপ্নের মানুষ। নয় নয় করে সিনেমা, নাটক, শ্রুতিনাটক, অ্যানিমেশন, কমিকস, মায় বিজ্ঞাপনেও মুখ দেখিয়ে ফেলেছে ফেলুদা। চলছে তথ্যচিত্র তৈরির কাজও। অনুবাদে ফেলুদার গল্প পড়ে ফেলেছেন বাংলা ছাড়াও অন্যান্য অনেক ভাষার পাঠক। অথচ প্রায় সব বয়সি পাঠকের কাছে সমান জনপ্রিয় ফেলুচাঁদকে নিয়ে সেই অর্থে একটা ব্র্যান্ড তৈরি হল না বাংলায়। বেকার স্ট্রিটে মিউজিয়াম আছে ফেলুদার গুরুর। রয়্যাল সোসাইটি অব কেমিস্ট্রি তাঁকে দিয়েছে সাম্মানিক ফেলোশিপ (হোক না তা খেলাচ্ছলে)। কিন্তু সোনাহাটির রিক্রিয়েশন ক্লাব বা গোঁসাইপুর সাহিত্য সংঘ-র বাইরে ফেলুদাকে কেউ সংবর্ধনা জানাবার কথা ভাবেনি। পঞ্চাশ বছরে ফেলুদার কি একটা মূর্তিও বসানো যায় না কলকাতায়?

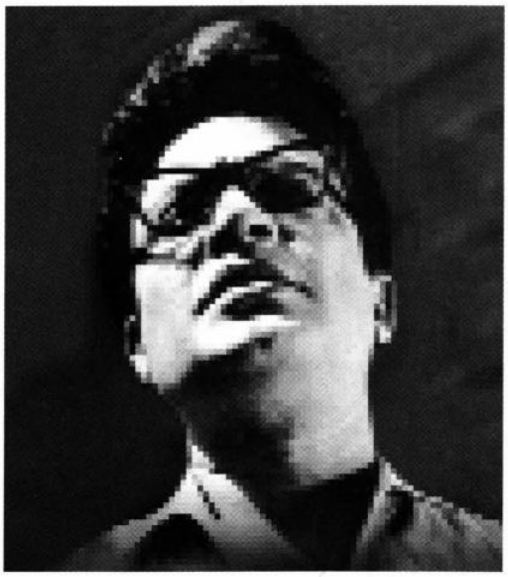

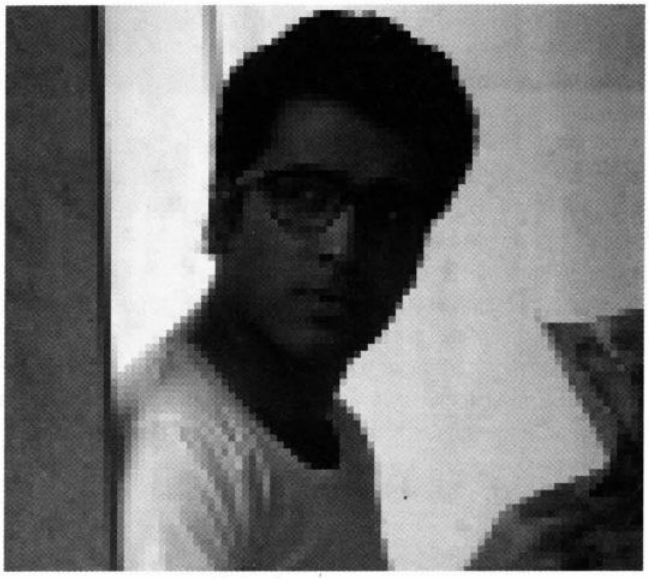

মসনদে সত্যান্বেষী

সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যোমকেশ বক্সী মানে কি উত্তমকুমার?

না, আবির চট্টোপাধ্যায়?

নাকি, এখন খানিকটা বিস্তৃতিতে চলে যাওয়া রজিত কাপুর?

স্বয়ং শরদিন্দু কী বলছেন?

ব্যোমকেশ সিরিজের প্রথম গল্পে তাঁর এন্ট্রি হচ্ছে এভাবে— 'আমিও উঠি উঠি করিতেছি, এমন সময় একটি লোক আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বয়স বোধ করি তেইশ-চব্বিশ হইবে, দেখিলে, শিক্ষিত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়। গায়ের রং ফরসা, বেশ সুশ্রী সুগঠিত চেহারা,— মুখে চোখে বুদ্ধির একটা ছাপ আছে।'

এবং বাঙালি এই বুদ্ধির প্রেমে পড়ে গেল। এবং ভালো লাগায় ডুবে গেল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। যিনি প্রায় একার হাতে, সাহিত্যের দুয়োরানি গোয়েন্দা গল্পের ধারাকে সাহিত্যের পদমর্যাদা ছিনিয়ে এনে দিলেন। উত্তমকুমার, আবির, রজিত কাপুর মিলিয়ে গেছেন। গল্পের পাতা থেকে সেলুলয়েডে আরও জনপ্রিয় হচ্ছেন ব্যোমকেশ বক্সী।

ডিটেকটিভ কাহিনি নিছক গল্পগুজব নয়। এ যেন দাবা খেলা। প্রখর মস্তিষ্ক সঞ্চালন। তদন্ত প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে গুটিয়ে আনাই মুনশিয়ানা। ব্যোমকেশের গল্পে এই শিল্পের কোনও তুলনা নেই। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শরদিন্দুবাবুর ভাষা। সাক্ষাৎ মণিকাঞ্চন যোগ। সবিনয়ে এবং সরাসরি, সত্যজিৎ রায়কে মাথায় রেখেও বলা যায়, গোয়েন্দা কাহিনির জটিলতা ও গল্পের ভাষা— এই দুই বিভাগে সবাইকে টেক্কা দিয়ে যাবেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

রোমাঞ্চকর এক একটি গোয়েন্দা কাহিনিতে ব্যোমকেশের অসামান্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, অনবদ্য বিশ্লেষণী দক্ষতাই তাঁকে সবার ওপরে স্থান করে দিয়েছে। তার ওপরে অজিতের সঙ্গে ব্যোমকেশের বন্ধুত্ব, সত্যবতীর সঙ্গে— প্রেম, বিয়ে ও খোকার জন্ম, এসব ব্যক্তিগত উপাদান শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাদু মশলার মতো ছড়িয়ে দিয়েছেন কাহিনির বিভিন্ন স্তরের ওপর। পাঠকরাও নিজের জীবনের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়ে একাত্ম হয়ে যান ব্যোমকেশের সঙ্গে। এই গোয়েন্দার জনপ্রিয়তার এও আরেকটা বড় কারণ। অবিকল এই ঘটনা ঘটেছিল শার্লক হোমসের সঙ্গেও। শার্লক হোমস যে রক্তমাংসের কোনও চরিত্র নয়, আর্থার কোনান ডয়েলের লেখা একটি গোয়েন্দা চরিত্র মাত্র, তাও বহু পাঠক মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। এখানেই সৃষ্টির সার্থকতা।

ব্যোমকেশ বক্সীর বাসস্থান ছিল হ্যারিসন রোডে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ভারতের স্বাধীনতালাভের পরেও অজিতকে নিয়ে হ্যারিসন রোডের বাসায় দিব্যি জীবন চলছিল ব্যোমকেশের। গোয়েন্দা কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে শরদিন্দু সেই সময়ের কলকাতার যে বিবরণ দিয়ে গেছেন, তাকে ডকুমেন্টেশন বলাই যুক্তিযুক্ত। এই সময়ে এসে সেই সময়ের কলকাতা ভ্রমণের স্বাদ নিতে ব্যোমকেশ রচনাবলির তুলনা নেই। তরতরে, গতিবান ভাষায় কাহিনিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে চলে ভ্রমণও। এই স্বাদ অন্য কোনও গল্পে তেমন নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম সত্যজিৎ রায়। তাঁর ফেলুদা সিরিজেও এমন বিবরণ কাহিনির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

বাংলায় প্রথম মৌলিক ডিটেকটিভ গল্পকাহিনি লিখেছিলেন পাঁচকড়ি দে। সেসব গল্পে বিদেশি গল্পের ছায়া পাঠকরা সহজেই ধরতে পারবেন। ব্যোমকেশের গল্পও খানিকটা শার্লক হোমসের আদলে তৈরি। কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে তা সম্পূর্ণ মৌলিক একটি চরিত্রে পরিণত হয়। এ ছাড়া কাহিনিগুলির নিজস্ব মেজাজ তো আছেই। সব

মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যে যদি ব্যোমকেশ বক্সীকে প্রথম সার্থক গোয়েন্দা চরিত্র বলা হয় তাহলে অত্যুক্তি হবে না।

ইদানীং বাংলা সাহিত্যে সমসাময়িক লেখকদের গোয়েন্দা চরিত্রের বড় একটা কদর দেখা যাচ্ছে না পাঠকমহলে। এখনকার অনেক লেখক নিয়মিত গোয়েন্দা গল্প লিখলেও সার্থক গোয়েন্দা চরিত্র তৈরি বা সেরকম অভিযানের কাহিনি লিখে পাঠকের মন মজাতে পারেননি। এই 'সমসাময়িক বাংলা' পত্রিকার গত দুটো উৎসব সংখ্যায় রবিশংকর বল 'র‍্যাব্‌স দত্ত' নামে একটি গোয়েন্দা চরিত্রের সৃষ্টি করেন। প্রথম অভিযানটি মাঝারি মানের হলেও দ্বিতীয় অভিযানটি একেবারেই জোলো। বাকিদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং বাঙালি পাঠক এখনও যে ব্যোমকেশ ও ফেলুদার ওপর আস্থা রাখবেন তা বলাই বাহুল্য। গোয়েন্দা গল্পের আকর্ষণ তো কমার নয়, তাই ক্রমে জনপ্রিয়তা বাড়ছে এই দুই গোয়েন্দার। সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পর ফেলুদা সিরিজ খানিকটা জৌলুস হারালেও ক্রমেই জনপ্রিয়তা বাড়ছে ব্যোমকেশ বক্সীর। বাংলা ১৩৩৯ সাল থেকে ১৩৪৩ সাল পর্যন্ত ব্যোমকেশকে নিয়ে দশটি গল্প লেখার পর সংশয় তৈরি হয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে।

পাঠকদের কি ভালো লাগছে ব্যোমকেশ— এই দ্বিধায় তিনি বেশ কিছুদিন আর গোয়েন্দা গল্প লেখেননি। এর মধ্যে বোম্বাই থেকে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। পরিমল গোস্বামীর বাড়িতে এক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে সেখানে উপস্থিত একদল কমবয়েসি ছেলেমেয়ে তাঁর কাছে জানতে চান, কেন আপনি ব্যোমকেশকে নিয়ে আর লিখছেন না? তখন তিনি উপলব্ধি করেন, এখনও ব্যোমকেশের চাহিদা প্রচুর। দীর্ঘদিন, প্রায় পনেরো বছর পর ১৩৫৮ সালে তিনি আবার 'চিত্রচোর' গল্পটি লেখেন। গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে ব্যোমকেশ সিরিজে মোট ৩২টি কাহিনি তিনি রচনা করেছেন। ১৯৭০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর শরদিন্দুবাবু ব্যোমকেশের একটি গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। কাহিনির নাম 'বিশুপাল বধ'। এই কাহিনি অবশ্য তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। ব্যোমকেশ সিরিজের প্রথম গল্প 'সত্যান্বেষী' মাসিক বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও রচনাকাল অনুসারে এই সিরিজের প্রথম গল্প 'পথের কাঁটা'। পরে ব্যোমকেশকে নিয়ে একটা সিরিজ লেখার কথা শরদিন্দুর মাথায় এলে তিনি ব্যোমকেশের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়ে একটি গল্প লেখেন, যার নাম 'সত্যান্বেষী'।

ব্যোমকেশের চরিত্র নিয়ে বলতে গিয়ে খোদ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, এ তাঁর 'সেল্‌ফ প্রজেকশন। নিজেরই আত্মকৃতি।'

বাস্তবিক, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে দারুণ মিল। একই রকম ধারালো চেহারা। তীক্ষ্ণ নাক। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। ঋজু চেহারা। সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রয়ী গল্প-উপন্যাসের কোনও তুলনা চলে না। যে দক্ষতার সঙ্গে তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র, পরিবেশ-পরিস্থিতি ফুটিয়ে তুলেছেন, বাংলা ভাষায় তেমন নজির বিশেষ নেই। প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসের পটভূমিকায় গোয়েন্দা গল্পের অবতারণা না করলেও, 'দুর্গরহস্য' কিন্তু অন্যরকম এক স্বাদ পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবে। প্রাচীন দুর্গ, তার মালিক, ষড়যন্ত্র, রাজনীতি— সব মিলিয়ে জমজমাট ব্যাপার। এতসব বিষয় নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে অভিযান সম্পন্ন করাও চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। এমনিতে ব্যোমকেশ একটু ঘরকুনো প্রকৃতির। প্রথমে হ্যারিসন রোড ও পরে কেয়াতলার বাসায় বসে একের পর এক জটিলতার জট খুলতেই সে বেশি পছন্দ করত। তবু মাঝেমধ্যেই মক্কেলদের ডাক পড়ত বাইরে থেকে। অজিতকে নিয়ে অগত্যা ব্যোমকেশও বাধ্য হত বেরিয়ে পড়তে।

শহর কলকাতার পাশাপাশি শরদিন্দুর লেখায় গ্রামবাংলার সেসব ছবি অবিকল ফুটে উঠেছে। এসেছে ছোটনাগপুর, বিহার এলাকার রুক্ষতাও, কোলিয়ারি অঞ্চল ফিরে এসেছে তাঁর লেখায়। শরদিন্দুবাবুকে দীর্ঘদিন মহারাষ্ট্রে কাজের উপলক্ষে থাকতে হয়েছে। অথচ ব্যোমকেশের কোনও কাহিনির জন্ম মুম্বই বা পুণেতে হয়নি। এটা সত্যিই বড় আশ্চর্যের বিষয়। এমনিতেই ব্যোমকেশের জনপ্রিয়তায় আকৃষ্ট হয়ে পরিচালক দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দিতে ব্যোমকেশকে নিয়ে সিনেমা করছেন। শরদিন্দুর লেখার পটভূমিকায় মুম্বই থাকলে এই সিরিজের কাহিনিগুলির সর্বভারতীয় গ্রহণযোগ্যতা নিঃসন্দেহে আরও বাড়ত। বাড়ত অনুবাদের সম্ভাবনাও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ বছরই শেষের দিকে দিবাকরের ব্যোমকেশ মুক্তি পাবে।

বাড়িতে পাতা দই খেতে ব্যোমকেশ বড় ভালোবাসে। সত্যবতী রোজ রাতে শোয়ার সময় দই পেতে রাখে। ব্যোমকেশের ঘর-সংসারের এসব ছবি তো বাঙালির নিজের ঘরের ছবি; তাই এত প্রিয়। বিভিন্ন কাহিনিতে যেভাবে টুকরো টুকরো ব্যোমকেশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, তা এক করলে কোনও বাঙালি পরিবারের বড় ছেলের কথা মনে পড়ে। অন্য গোয়েন্দা গল্পে এমন ছবি বিরল। সেখানে, গোয়েন্দার অন্তঃপুরে পাঠকদের প্রবেশ নিষেধ। ফেলুদা কী খেতে ভালোবাসে— ক'জন তার খবর রাখে! আসলে জটিল সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি ব্যোমকেশের ঘরকন্না করার ছবিটিও পরম মমতায় এঁকেছেন শরবিন্দু।

বলা যেতে পারে, ব্যোমকেশ বক্সী একমাত্র গোয়েন্দা, যে বিবাহিত। অন্য সব গোয়েন্দা চরিত্র তো নারী-বিবর্জিতই বলা যায়। এই একটি ক্ষেত্রে নির্মাণের ত্রুটির দায় প্রায় কোনও লেখকই এড়িয়ে যেতে পারবেন না। নারী চরিত্রের সংস্পর্শ না থাকায় গোয়েন্দাদের ঠিক রক্তমাংসর মানুষ বলে মনে হয় না। এখানেই পাঠকদের মন জিতে বসে আছেন শরদিন্দু। ব্যোমকেশ-সত্যবতীর কাহিনি এক অর্থে প্রেমকাহিনিও বটে। খোদ শরদিন্দু এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'প্রতিটি কাহিনীকে আপনি শুধু সামাজিক উপন্যাস হিসাবেও পড়তে পারেন। কাহিনীর মধ্যে আমি পরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই।'

এখানেই তাঁর রচনার সার্থকতা।

এটাই ব্যোমকেশের জনপ্রিয়তার ইউএসপি।

সিনেমায় ব্যোমকেশ

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

গোয়েন্দা উপন্যাস নিয়ে সিনেমা করার এক বছর আগেই জীবনের প্রথম গোয়েন্দা গল্প লিখে ফেলেছেন সত্যজিৎ রায়। কিন্তু প্রথম যে গোয়েন্দা ছবিটি তিনি করছেন, সেটি তাঁর নিজের তৈরি গোয়েন্দা ফেলু মিত্তিরকে নিয়ে নয়, সেটি হল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশকে নিয়েই। আসলে ব্যোমকেশকে সিনেমায় নিয়ে আসেন তো সত্যজিৎই। সময়টা ১৯৬৬ সাল। তৈরি হল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ডিটেকটিভ ছবি 'চিড়িয়াখানা'। ঠিক এর এক বছর আগে 'সন্দেশ' পত্রিকায় ফেলুদার আত্মপ্রকাশ। ১৯৬৫ সালের অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর সংখ্যায় বেরোল 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'। পরের বছর অর্থাৎ কিনা ১৯৬৬ সালেই তিনি লিখলেন প্রথম ফেলুদা উপন্যাস 'বাদশাহী আংটি' আর সেই বছরই 'চিড়িয়াখানা'। এর পরে আরও বেশ কয়েকটি গোয়েন্দা ছবি করলেও সত্যজিৎ কিন্তু আর শরদিন্দু বা অন্য কোনও লেখকের কাহিনি নিয়ে ছবি করেন না, যা করেন তা নিজেরই কাহিনি নিয়ে— গোয়েন্দা সেখানে ফেলু মিত্তিরই।

সাহিত্যে ব্যোমকেশের জন্ম ৭ আষাঢ়, ১৩৩৯। তো শরদিন্দু ব্যোমকেশকে নিয়ে প্রথম গোয়েন্দা গল্প লিখেছিলেন ওই দিনই। যা ১৯৩২ সালের জুন সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়। এর পাঁচ মাস পরে ব্যোমকেশকে নিয়ে দ্বিতীয় গল্প 'সীমন্ত হীরা'। আর এর পরেই লেখক শরদিন্দু ঠিক করেন ব্যোমকেশকে নিয়ে সিরিজ লিখবেন। যার শুরু ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত 'সত্যান্বেষী'কে দিয়ে। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬— এই তিন মাস ব্যোমকেশকে নিয়ে দশটি কাহিনি বেরোয়। ব্যোমকেশ যখন পাঠকমহলে তুমুল পপুলার, তখনই ব্যোমকেশকে নিয়ে কাহিনি লেখা বন্ধ করে দেন শরদিন্দু। এবং ১৫ বছর পর পাঠকের দাবিতেই ব্যোমকেশকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন তিনি। ১৯৫১ থেকে ১৯৭০, মৃত্যুর আগে অবধি ব্যোমকেশকে নিয়ে তিনি আরও গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে ২৩টি কাহিনি লেখেন। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, বাংলায় এখনও না হলেও হিন্দিতে কিন্তু পরিচালক বাসু চট্টোপাধ্যায় এই তেত্রিশটি গল্প নিয়ে টেলি ছবি করেছেন— ব্যোমকেশকেন্দ্রিক এক সিরিয়ালে।

সত্যজিতের পরে সিনেমায় ব্যোমকেশকে নিয়ে এসেছেন এক নারী পরিচালক— মঞ্জু দে। তিনি 'সজারুর কাঁটা' চিত্রায়িত করেন। তারপর তো দীর্ঘ একসময় বাংলা সিনেমা ব্যোমকেশহীন ছিল। সেই সময় অবশ্য যেমন গোয়েন্দা সাহিত্যে, তেমনি সিনেমাতেও সত্যজিতের ফেলুদা দারুণভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলেন। সত্যজিতের মৃত্যুর পরেও তাঁর পুত্র সন্দীপ রায় ফেলুদা সিরিজ নিয়ে কয়েকটি ছবি করেন।

সত্যজিৎ শুরু করার পর ব্যোমকেশ সিনেমায় আসছেন আরও সাত বছর পর। আগেই বলেছি, মহিলা পরিচালক মঞ্জু দে-র হাত ধরে। কিন্তু সেই '৭৪ সাল থেকে বাংলা সিনেমায় দীর্ঘ সময় আর ব্যোমকেশের দেখা পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে অবশ্য দূরদর্শনে ব্যোমকেশ এসেছেন— শুধু একবার নয়, অন্তত দু'বার— ঠিক অর্থে, ব্যোমকেশের সব গল্পই টেলিভিশনে দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বাংলা সিনেমায় ব্যোমকেশ মাত্র সেই এসেছেন সত্যজিৎ আর মঞ্জু দে-র হাত ধরেই— ব্যাস, আর নয়। মনে প্রশ্নটা জাগেই, কেন বাংলা সিনেমার পরিচালকরা ব্যোমকেশকে অবলম্বন করলেন না। সত্যজিতের ব্যোমকেশ ছিলেন স্বয়ং উত্তমকুমার। তবে সত্যজিতের পরিকল্পনায় 'চিড়িয়াখানা' নির্মাণের কোনও ভাবনা ছিল না। আসলে সত্যজিতের এক সহকারী 'চিড়িয়াখানা' নিয়ে ছবি করার পরিকল্পনা করেন। তাঁরা চিত্রনাট্য লিখে দেবার জন্যে সত্যজিৎকে

অনুরোধ করেন। চিত্রনাট্য পড়ে ছবির প্রযোজক বলেন, সত্যজিৎ যদি এই ছবি পরিচালনা করেন, তবেই তিনি এই ছবিতে টাকা ঢালবেন, নচেৎ নয়। সত্যজিতের সহকারীরা এই ছবিকে ঘিরে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরাও এবার সত্যজিৎকে অনুরোধ করেন, শুধু চিত্রনাট্য নয়, সত্যজিৎ যদি এই ছবিটি পরিচালনা করেন। সত্যজিৎ সহকারীদের কথা ভেবেই রাজি হন।

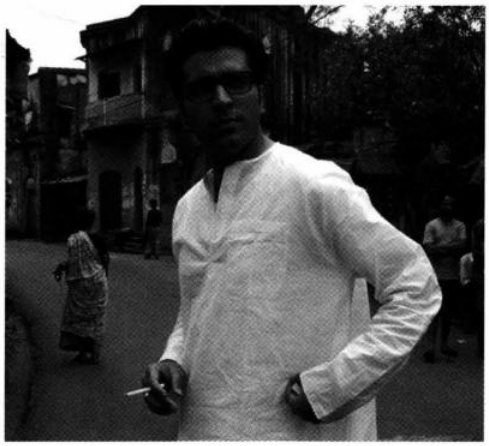

স্বাভাবিকভাবেই শার্লক হোমস-ভক্ত সত্যজিৎ রায় যখন 'চিড়িয়াখানা'র চিত্রনাট্য লেখেন, মূল কাহিনি থেকে তিনি অনেকটাই সরে আসেন। শরদিন্দুর পটভূমি ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পরে, অর্থাৎ কিনা ১৯৪৬ সাল। সত্যজিতের চিত্রনাট্যে সেটা হয়ে ওঠে ১৯৬৬। এবং হোমসের মতো সত্যজিতের ব্যোমকেশও ঘরে বসে চিন্তাশক্তিতে বিশ্বসী। সত্যজিতের নিজের গোয়েন্দা ফেলুদার মতোই তাঁর ব্যোমকেশের প্রধান ভরসা মগজাস্ত্রতেই। শরদিন্দুর গল্পের প্রধান নায়িকা হলেন একদা নায়িকা, যার নাম বনলক্ষ্মী। এই একদা নায়িকা বনলক্ষ্মীকে দারুণভাবে কাজে লাগালেন সত্যজিৎ। তাঁকে ঘিরে 'বিষবৃক্ষ' ছবির একটি সিকোয়েন্সই তৈরি করেন। গানের সিকোয়েন্স। আর নায়িকার মুখের গানটি লেখেন স্বয়ং সত্যজিৎ— 'ভালোবাসার তুমি কী জানো'। শরদিন্দুর মূল গল্পে টেপরেকর্ডারের ব্যবহার ছিল না। সময়ের হিসেবে তা থাকার কথা নয়। কিন্তু যেহেতু সত্যজিৎ সময়কালটিকে টেনে এনেছেন ১৯৬৬-তে, তাই ছবিতে টেপরেকর্ডার মূল প্লটেরই এক অন্যতম চরিত্র হয়ে ওঠে। এমনকী খুনের ব্যাপারেও টেপরেকর্ডার একটা বড় ভূমিকা পালন করে। ছবিতে ব্যোমকেশ এক সাপ পোষেন— এটাও অবশ্যই মূল গল্পে ছিল না।

সত্যজিতের 'চিড়িয়াখানা', শরদিন্দুর 'চিড়িয়াখানা'র মূল ভাবনাকে স্পর্শ করেও স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। সাহিত্য থেকে সার্থক সিনেমা করে তোলেন সত্যজিৎ।

সত্যজিৎ তাঁর 'চিড়িয়াখানা'কে করে তোলেন প্রেম ও প্রেমহীনতার এক সম্পর্কের গল্প। শরদিন্দুর গল্পের প্রধান মোটিভই ছিল প্রেম। সত্যজিৎ তাঁর ছবিতে রহস্য গল্পকে প্রেমের গল্প হয়ে ওঠার কোনও সুযোগই দেন না। তথাকথিত প্রেমিকা বনলক্ষ্মী, প্রেমিক ভুজঙ্গ দাস ধরা পড়ার পরে নিজেই সরাসরি অভিযুক্ত করেন ভুজঙ্গকে। অথচ শরদিন্দুর মূল উপন্যাসে ভুজঙ্গ দাস ও বনলক্ষ্মীর প্রেমে কোনও সংশয় ছিল না। এই কথা শরদিন্দুর 'চিড়িয়াখানা'র শেষ অংশ উল্লেখ করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। খুনি হিসেবে ভুজঙ্গের ধরা পড়ার পর বর্ণনাটি দেখা যাক— 'ভুজঙ্গ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিরাট রিভলবার বাহির করিল। কিন্তু রিভলবার দরকার হইল না। ভুজঙ্গ বনলক্ষ্মীর কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর যে অভিনয় হইল, তাহা বাংলাদেশের মঞ্চাভিনয় নয়, হলিউড সিনেমা। বনলক্ষ্মী উঠিয়া ভুজঙ্গের কণ্ঠলগ্না হইল। ভুজঙ্গ তাহাকে বিপুল আবেগে জড়াইয়া লইয়া তাহার উন্মুক্ত অধরে দীর্ঘ চুম্বন করিলেন। তারপর তাহার মুখখানি দুই হাতের মধ্যে লইয়া স্নেহক্ষরিত স্বরে বলিলেন, 'চল এবার যাওয়া যাক।' মৃত্যু আসিল অকস্মাৎ। বজ্রপাতের মত দু'জনের মুখের মধ্যে কাচ চিবানোর মত একটা শব্দ হইল। দু'জন একসঙ্গে পড়িয়া গেল। যেখানে দেওয়ালের গায়ে নিশানাথের ছবি ঝুলিতেছিল তাহারই পদতলে ভূলুণ্ঠিত হইল।'

এই প্রেম-রোমান্স ইত্যাদিকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছিলেন সত্যজিৎ। পরবর্তীকালেও যখন সত্যজিৎ ফেলুদা সিরিজের ছবি করেন, তখনও কিন্তু তিনি গোয়েন্দা এবং তাঁর ছবিকে প্রেমহীনই রাখেন। রহস্য ও প্রেম কখনও যুগলবন্দি হয় না, অন্তত এই বিশ্বাস রাখতেন সত্যজিৎ।

কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে হঠাৎ আবার বাংলা সিনেমায় ব্যোমকেশপ্রবণতা দেখা গেল। আর সেই প্রবণতাতে রহস্যের চেয়ে প্রেমই যেন বারবার প্রাধান্য পেতে থাকল। একবিংশ শতাব্দীতে যে ব্যোমকেশ সিনেমায় তৈরি হল, তার সম্পর্কে আলোচনায় আসছি, কিন্তু তার আগে একটা প্রবণতার কথা বলে রাখা দরকার। ব্যোমকেশ থেকে সিনেমা তৈরির একটা প্রকল্পনা তৈরি করে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ তাঁর 'চিড়িয়াখানা'য়। এই ছবিতে ব্যোমকেশ ছিলেন অবশ্যই অকৃতদার এবং সবচেয়ে বড় কথা, ব্যোমকেশের বাঙালিয়ানাকে খুবই আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। একে সত্যজিৎ, সঙ্গে উত্তমকুমার— দু'জনে মিলে 'চিড়িয়াখানা'য় ব্যোমকেশকে করে তোলেন বাঙালি আইকন।

প্রশ্নটা ব্যোমকেশের বাঙালিয়ানার। বিংশ শতাব্দীতে ব্যোমকেশ শুধু সত্যজিতের ছবিতেই নয়, মঞ্জু দে-র 'সজারুর কাঁটা'তেও এসেছেন আপামর বাঙালি চেহারাতেই। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে যখন দীর্ঘকাল পরে সিনেমায় ব্যোমকেশ ফিরে এলেন, তখন কিন্তু সেই বাঙালিয়ানায় অনেক বদল ঘটেছে। তা সে স্বপন সাহা বা অঞ্জন দত্ত— যাঁর ছবিতেই তিনি এসে থাকুন না কেন। যেমন ২০০৯ সালে স্বপন সাহা (ইনি 'বাবা কেন চাকর'খ্যাত স্বপন সাহা নন) যখন 'মগ্ন মৈনাক' নিয়ে ব্যোমকেশকে সিনেমায় আনেন, তখন কিন্তু বাঙালি দর্শক স্বপনের ব্যোমকেশকে মেনে নিতে পারেননি। কেউ হয়তো বললেন, আসলে সত্যজিৎ-উত্তমের যুগলবন্দির রেশ বাঙালি দর্শকের মনে এমনভাবে রয়ে গিয়েছিল যে 'মগ্ন মৈনাক'-এর ব্যোমকেশকে তাঁরা মন থেকে গ্রহণ করে উঠতে পারেন না। তবে এই প্রশ্ন উঠতেই পারে, তাহলে বাসু চট্টোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ রজিত কাপুরকে কী করে বাঙালি দর্শক সাদরে মন থেকে গ্রহণ করতে পেরেছিল? ২০০৯ থেকেই ব্যোমকেশকে নিয়ে ছবি করার ঢল নামে— তার জের অবশ্য এখনও চলছে। শরদিন্দুর গল্প 'চিত্রচোর' আর 'কহেন কবি কালিদাস' নিয়ে 'ব্যোমকেশ' নামে ছবি করেন অঞ্জন। আবির চট্টোপাধ্যায় হলেন অঞ্জনের ব্যোমকেশ। আবিরের অভিনয় ত্রুটি নয়, অঞ্জনের চিত্রনাট্যের ব্যর্থতাই আবিরকে বাঙালি ব্যোমকেশ হতে দেয়নি। এবং এই একই ব্যর্থতার শিকার অঞ্জনের 'আবার ব্যোমকেশ'ও।

সাহিত্যিক হলেও, সিনেমা মাধ্যমটির সঙ্গে ভালোই পরিচিত ছিলেন শরদিন্দু। দীর্ঘ সময় মুম্বই ফিল্মি দুনিয়ায় তিনি চিত্রনাট্যকার হিসেবে জড়িয়ে ছিলেন। আর সেই সূত্রেই তাঁর লেখার মধ্যে সিনেমার প্রকরণ নানাভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এই প্রকরণকে কিন্তু সার্থকভাবে কাজে লাগালেন ঋতুপর্ণ ঘোষ, তাঁর জীবনের শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'সত্যান্বেষী'তে। এই ছবির ব্যোমকেশ হলেন সুজয় ঘোষ। পরিচালক ঋতুপর্ণ অবশ্য তাঁর জীবনের শেষ ছবির বিষয় হিসেবে বেছে নেন শরদিন্দুর ব্যোমকেশকে। যেখানে অবশ্য ঋতুপর্ণ নিজস্ব স্টাইলে যৌনতার এক ক্রমমুক্তি ঘটান। যার ইঙ্গিত অবশ্য শরদিন্দুর কাহিনির মধ্যেই ছিল। এবং ঋতুপর্ণর ব্যোমকেশ আবার সিনেমায় বাঙালিয়ানাকে পুনরুদ্ধার করেন। শেষ খবর, পরিচালক দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়েন্দা ব্যোমকেশকে নিয়ে ছবি করতে চলেছেন। টিভিতে হলেও হিন্দি সিনেমায় এই প্রথম ব্যোমকেশ। দেখা যাক আরব সাগরের তীরে ব্যোমকেশ কতটা বাঙালি থাকতে পারেন।

কাকাবাবুর জনপ্রিয়তার ইউএসপি

রতনতনু ঘাটী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিশোরদের জন্যে লিখতে শুরু করেন তাঁর লেখক-জীবনের অনেক পরের দিকে। প্রথম দিকে তিনি ছিলেন ছোটদের গল্পের শুধুই মনোযোগী পড়ুয়া। তিনি তাঁর একটি বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, তিনি যখন ছোটদের জন্যে লেখেন, তখন তাঁর বয়সটাও যেন কমে যায়। কমতে-কমতে একেবারে বারো বছর বয়সের কিশোর হয়ে যান তিনি। লেখক-জীবনের পরের দিকে লিখতে শুরু করলেও, আমরা যখন তাঁর কিশোর সাহিত্যের দিকে তাকাই, তখন তার বিপুল আয়তনে মুগ্ধ হই, সেই সঙ্গে আমরা অবাকও হয়ে যাই।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আগে বাংলা সাহিত্যে অনেক 'দাদা'র আবির্ভাব ঘটে গিয়েছে। সেইসব দাদা বাংলা সাহিত্যের আসরে বেশ জাঁকিয়ে বসে ছিলেন। যেমন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের ভজহরি মুখার্জি, মানে 'টেনিদা', প্রেমেন্দ্র মিত্রর ঘনশ্যাম দাস, মানে 'ঘনাদা',

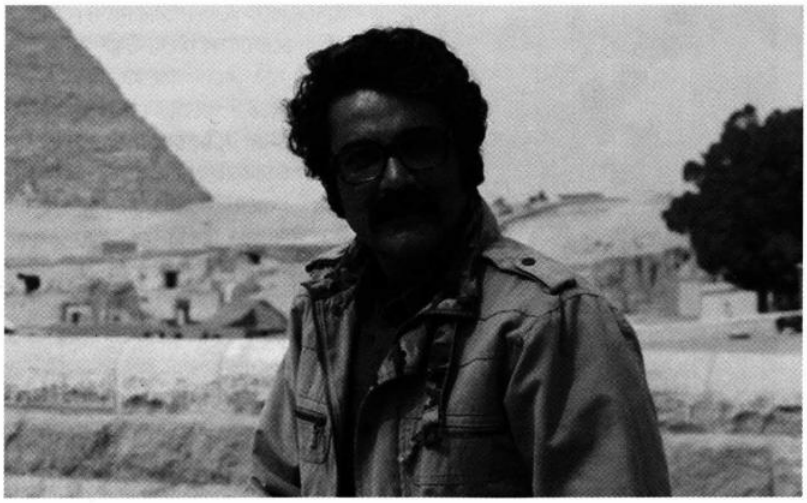

সত্যজিৎ রায়ের ফেলু মিত্তির, মানে 'ফেলুদা', বুদ্ধদেব গুহর ঋজু বোস, মানে 'ঋজুদা', আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গল্পের প্রদীপনারায়ণ দত্ত, মানে 'পিনডিদা'। এই চরিত্রদের রাজপাটের পাশে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু নতুন করে আর কোনও 'দাদা' চরিত্র সৃষ্টি করতে যাননি। তিনি বরং তৈরি করেছেন 'কাকাবাবু' চরিত্রটি।

কাকাবাবুর নাম রাজা রায়চৌধুরী। তাঁর ডাকনাম 'খোকা'। তিনি আর্কিয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর ছিলেন। অবসর গ্রহণ করেছেন। এই চরিত্রটি সৃষ্টির পিছনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনও ইচ্ছে কাজ করেছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন তাঁর 'কাকাবাবু সমগ্র-১' বইটির ভূমিকায়। তিনি লিখেছেন, 'একবার আমি একজন খোঁড়া মানুষকে খুব উঁচু পাহাড়ে উঠতে দেখেছিলাম। তাঁর যেন একটুও কষ্ট হচ্ছিল না। তখন আমি ছোট, সন্তুরই বয়েসি। সেই মানুষটিকে দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, অসাধারণ তাঁর মনের জোর, আর এরকম মনের জোর থাকলে মানুষ যে কোনও বাধাকেই জয় করতে পারে। সেই মানুষটিই কাকাবাবু।'

সন্তু-কাকাবাবুর প্রথম কাহিনি প্রকাশিত হয় 'আনন্দমেলা' পত্রিকার ১৯৭৯ সালের পূজাবার্ষিকীতে। সেই 'ভয়ংকর সুন্দর' উপন্যাসে সন্তুর মুখ থেকে আমরা শুনি, 'কাকাবাবু তো জন্ম থেকেই খোঁড়া নন। মাত্র দু'বছর আগে কাকাবাবু যখন আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন, তখন কাবুলের থেকে খানিকটা দূরে ওঁর গাড়ি উলটে যায়। তখনই একটা পা একেবারে চিপসে ভেঙে গিয়েছিল।'

কাকাবাবুর খোঁড়া পায়ের আর-একটি প্রসঙ্গ পাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাকাবাবুর প্রথম অভিযান' উপন্যাসে। কাকাবাবু একবার মধ্যপ্রদেশে এক অভিযানে গিয়েছিলেন। সেখানে কমল আতাতুর্ক নামে একটি লোক নদীতে ডুবে যাচ্ছিল। তাকে বাঁচাতে গিয়ে কাকাবাবু বেশ খাড়াই একটা পাথরের উপর থেকে পড়ে যান। তখন তাঁর পায়ের গোড়ালির হাড় গুঁড়ো হয়ে যায়। তারপর থেকে তিনি ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে পারেন না।

কাকাবাবুর খোঁড়া পায়ের প্রসঙ্গে স্বয়ং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েরই এরকম দু'টি অভিমত পাই আমরা। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, কাকাবাবু চরিত্রের মধ্যে যে প্রবল মানসিক শক্তির প্রকাশ, তার কোনও রকমফের হয় না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিশোরদের মনের মধ্যে যে অসীম মনোবল, সাহস আর অদম্য প্রাণশক্তি সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, তারই প্রকাশ এই কাকাবাবু চরিত্রটি।

কাকাবাবুর নানা অভিযানের সঙ্গী সন্তু, মানে বালিগঞ্জের তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনের ক্লাস এইটের ছাত্র সুনন্দ রায়চৌধুরী। 'ভয়ংকর সুন্দর' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সন্তু-কাকাবাবু সিরিজের প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসে সন্তুর জবানিতে আছে, 'আমি গত বছর ফাইনাল পরীক্ষায় সেকেন্ড হয়েছি, কিন্তু স্পোর্টসে চারটে আইটেমে ফার্স্ট হয়েছিলুম।' সন্তু ঘোড়ায় চড়তে পারে, খুব ভালো সাঁতারও জানে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সন্তু চরিত্রটি সম্পর্কে 'কাকাবাবু সমগ্র-১'-এর ভূমিকায় লিখেছেন, 'সন্তুও কাকাবাবুর কাছ থেকে তেমনই মনের জোর পেয়েছে, যে জন্য কোনও বিপদেই সে ভয় পায় না। কাকাবাবু ডিটেকটিভ নন, খুন-ডাকাতির তদন্ত করেন না। রহস্যময় দুঃসাহসিক অভিযানেই তাঁর আগ্রহ, সন্তুও তাতেই মেতে ওঠে।'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন, তিনি কাকাবাবু চরিত্রটিকে এমন বৃহৎ প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে নিয়ে ছোটগল্প লেখার কাজটি খুব সহজ নয়। সে কথা সুনীলবাবু নিজে তাঁর 'কাকাবাবু সমগ্র-৩'-এর

ভূমিকায় জানিয়েছেনও, 'কাকাবাবু এমনই বড় মাপের মানুষ যে, তাঁকে ছোটগল্পে ঠিক আঁটানো যায় না।'

তবু, আমরা তাঁর সমগ্র কিশোর সাহিত্য খুঁজলে দেখতে পাই, এই স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কাকাবাবু এবং তাঁর ভাইপো সন্তুকে নিয়ে তিনটি গল্প লিখেছিলেন, সে হয়তো এই চরিত্র দু'টির দুর্বার আকর্ষণেই।

কাকাবাবু ও সন্তুকে নিয়ে তাঁর একটি গল্প 'মহাকালের লিখন'। এই গল্পটি শুরু হয় এভাবে, ''সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে কাকাবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এ কী! এগুলো কীসের ডিম?'" এই গল্পের জলকন্যা কিশোরদের এক অচিন লোকে নিয়ে যায়। এই গল্পে লেখেন, 'দ্বীপটা একেবারে সুন্দর আঁকা একটা ছবির মতন। তীরের কাছে মিহি, সাদা বালি ছড়ানো। তারপর নানান রঙের নুড়িপাথর। তারপর গাছপালা। তবে এখানকার জঙ্গল খুব ঘন নয়। বোধহয় কখনও কখনও সমুদ্র ফুলে উঠে পুরো দ্বীপটা ডুবিয়ে দেয়।' সহজ ভাষায় আর একদম ছোট বাক্যে কিশোরদের জন্যে লিখতেন তিনি। ছোটদের সেইসব গল্প গড়গড়িয়ে পড়তে একটুও অসুবিধে হত না। তাই তিনি সহজেই খুদে পাঠকের মন জয় করে নিতেও পারতেন।

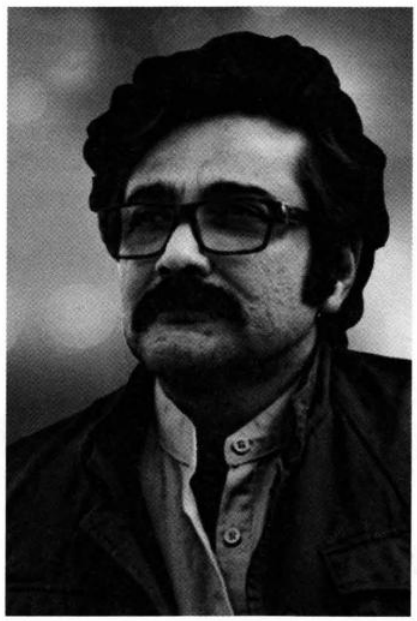

কাকাবাবু ও সন্তুকে নিয়ে আর-একটি গল্প 'কাকাবাবু বনাম মূর্তিচোর'। এই গল্পে তিনি লেখেন, 'যারা মানুষ মারে, অন্যের সম্পত্তি ছিনিয়ে নেয়, কোনও দেবতা কি তাদের সমর্থন করতে পারেন? আজকালও দেখবি, যারা খাদ্যে ভেজাল দেয়, জোচ্চুরি করে, গরিবদের ঠকায়, তারাই আবার মন্দির বানায়, ঢাকঢোল বাজিয়ে পুজো দেয়। এসবই মিথ্যে। মানুষকে ভালোবাসাই সবচেয়ে বড় পুণ্যের কাজ।' জীবনের চিরন্তন সত্যটিকে কিশোরদের মনের মতো ভাষায় তিনি পৌঁছে দেন কিশোরদের কাছে। গল্পের মধ্যে দিয়ে কিশোরদের শেখান গভীর মূল্যবোধের কথাও। এই সত্যে কিশোরদের অনুপ্রাণিত করে তোলেন তাঁর লেখায়। কাকাবাবু এবং সন্তু হাজির আরও একটি গল্পে। গল্পটির নাম 'একটি লাল লঙ্কা'। গল্পটি শুরু হয় এভাবে, ''কাকাবাবু বললেন, 'অসম্ভব! তোমার কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি এ প্রসঙ্গে আর আমার কাছে বোলো না!'" পাঠককে প্রথম লাইন থেকেই গল্পের গভীরের দিকে টেনে নিয়ে যান তিনি। এটাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গদ্যের সবচেয়ে বড় গুণ। এই গল্পে যেমন ইয়েতিও আছে, তেমনই আছে পাহাড়ের অনেক উঁচুতে লাল ক্যাপসিকামের মতো একটা বিষফল খেয়ে সন্তুর অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো রোমাঞ্চকর ঘটনাও। এভাবেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কিশোর কাহিনির শুরু থেকেই পাঠককে টেনে নিয়ে যান গল্পের ভিতরে। তাঁর কিশোর সাহিত্যের চমৎকারিত্বও এখানে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্যের সিংহভাগটাই হল সন্তু-কাকাবাবুর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। সন্তু-কাকাবাবুকে নিয়ে মোট উনচল্লিশটি কাহিনি লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। অসম্ভব মনের জোর, হার-না-মানা সাহস, মানবিকতা এবং পরোপকারের চেষ্টাই সন্তু-কাকাবাবু কাহিনির মূল কথা। তাঁর সময়ে যখন বাংলা কিশোর সাহিত্য জুড়ে খুবই সাদামাঠা নানা গোয়েন্দা কাহিনির দাপট, তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে জোরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সন্তু-কাকাবাবুর কাহিনিকে তথাকথিত গোয়েন্দা উপন্যাস করে তোলেননি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'কাকাবাবু সমগ্র-২' বইটির ভূমিকায় লিখেছেন, 'কাকাবাবু আর সন্তু রহস্যের সন্ধানে ভারতের নানা অঞ্চলে যায়। কখনও দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায়, কখনও গভীর জঙ্গলে, কখনও সমুদ্রের দ্বীপে। এবারে ওরা একটি অভিযানে গেছে ভারতের বাইরে, আফ্রিকার কেনিয়ায়। সেরিংগেটি অরণ্যে হোটেলের তাঁবুতে শুয়ে শুয়ে শোনা যায় সিংহের গর্জন, রাত্তিরবেলা খুব কাছ দিয়ে চলে যায় জলহস্তী আর হাতির পাল।' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মজা করে তারপরেই লিখেছেন, 'কাকাবাবুরা যে তাঁবুতে ছিলেন, কিছুদিন পর ঠিক সেই তাঁবুতে আমি থেকে এসেছি কয়েকদিন।'

একালের সবচেয়ে জনপ্রিয় অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি সন্তু-কাকাবাবু সিরিজের প্রথম উপন্যাস 'ভয়ংকর সুন্দর'-এ সন্তু ছাড়াও আরও একটি কিশোর চরিত্র আছে, তার নাম রিনি। এর পর তাঁর 'কলকাতার জঙ্গলে' উপন্যাসে পাই দেবলীনা দত্তকে। সেও বেশ কয়েকটি অভিযানে কাকাবাবুদের সঙ্গী হয়েছে। অলি নামে একটি মেয়েও এই সিরিজে সঙ্গী হয়েছে। কিন্তু এই সিরিজে সবচেয়ে মজাদার চরিত্র হল জোজো। সে আদ্যন্ত এক গুলবাজ ছেলে। কথায়-কথায় সে এমন বানিয়ে-বানিয়ে নানা মজাদার ব্যাপার জুড়ে দিতে পারে যে, পাঠক সেসব পড়ে একদম হাসি চেপে রাখতে পারেন না। তবে জোজোর এইসব গুলগল্প আসলে একেবারেই নির্দোষ মিথ্যে। জোজোর বলার গুণে সেসব মিথ্যে উদ্ভট গল্প কখনও কখনও সত্যি বলে পাঠকের সমর্থন আদায় করে নিতে পারে। সেইভাবে কঠিন সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখলে জোজোকে হয়তো অনেকটাই 'ফ্ল্যাট ক্যারেক্টার' বলে মনে হতে পারে। সমালোচকরা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের তৈরি জোজোকে একটি গুরুত্বহীন চরিত্র বলে উল্লেখও করেন। কিন্তু এ কথা তো ঠিক, এই চরিত্রটি ছিল বলেই সন্তু-কাকাবাবু সিরিজ কিশোরদের কাছে অনেকটাই বেশি জনপ্রিয়তা আদায় করে নিতে পেরেছে। আর জোজো খুদে পাঠকদের দিয়েছে এক নির্মল আনন্দ, এই কাহিনিকে দিয়েছে এক আশ্চর্য গতিময়তা।

যেমন, 'কাকাবাবু ও জলদস্যু' উপন্যাসে আছে, ''সন্তু বলল, 'তুই যে তখন বলেছিলি, তোর বাবার সঙ্গে হনলুলু যাবি?'

'জোজো বলল, ঠিক সেই মাসেই হনলুলুতে বিরাট ভূমিকম্প হল, তোর মনে নেই?... তা ছাড়া অমিতাভ বচ্চন তাঁর ছেলের বিয়েতে আমাদের বাড়িসুদ্ধ সবাইকে নেমন্তন্ন করলেন। সে বিয়েতে বাবাই তো ছিলেন চিফ কনডাক্টর।'"

'কাকাবাবুর চোখে জল' উপন্যাসে আছে, ''সন্তু বলল, 'তুই যে বিছানায় বসে-বসে ব্রেকফাস্ট খাস? তা হলে খাওয়ার টেবিল থাকে কেন বাড়িতে?'

'জোজো বলল, 'ওটা হচ্ছে রোমান স্টাইল। রোমের বড় বড় লোকেরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে খেত আর বিরাট বিরাট ঢেকুর তুলত। আমার অবশ্য ঢেকুর ওঠে না।'"

কিংবা 'রাজবাড়ির রহস্য'য় ওড়িশার কেওনঝড়ের রাজবাড়িতে কাকাবাবু সারাদিন ধরে ঘুমোচ্ছিলেন। কিছুতেই তাঁর ঘুম ভাঙছে না

দেখে, ''জোজো বলল, 'সেটসি মাছি কামড়েছে। আমি আফ্রিকায় দেখেছি, সেটসি মাছির কামড় খেয়ে অনেকের এইরকম ঘুম-রোগ হয়। ভেরি ডেঞ্জারাস!''

আর আছেন নরেন্দ্র ভার্মা নামে একজন আইপিএস অফিসার। তিনি কাকাবাবুকে অনেক অভিযানেই সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন।

সন্তু-কাকাবাবুর অনেক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির পটভূমি বিদেশ। এতে কাহিনিতে এসেছে বৈচিত্র, নতুনত্ব। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজে প্রায় সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছেন। সেই সুবাদে কাকাবাবুরা কখনও গিয়েছেন মিশরে, আফ্রিকায়, কখনও গিয়েছেন ইউরোপে, আবার কখনও পৌঁছে গিয়েছেন সিরিয়ায়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই সন্তু-কাকাবাবুর সিরিজের বিষয়ের চমৎকারিত্বও প্রতিটি কাহিনিকে নতুন করে তুলেছে। তাই 'আনন্দমেলা'র মতো এমন নামী কিশোর পত্রিকায় দীর্ঘ তেত্রিশ বছর ধরে এমন বিপুল জনপ্রিয়তার সঙ্গে কিশোরদের পছন্দের শীর্ষে থাকতে পেরেছে সন্তু-কাকাবাবুর কাহিনি। এমনকী, পাঠকের মন জয় করতে তিনি অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে কাহিনির গায়ে নিপুণতার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন ভ্রমণের আনন্দও। ভ্রমণবিলাসী বাঙালি পাঠককে তাই এই কাহিনি এনে দিয়েছে অন্য এক জনপ্রিয়তা।

এই সিরিজের প্রথম কাহিনি 'ভয়ংকর সুন্দর'-এ কাকাবাবু আর সন্তু গিয়ে হাজির সোনমার্গে। কাকাবাবু সকলকে বলেছেন, তিনি নাকি এখানে গন্ধকের খনি আবিষ্কার করতে এসেছেন। কিন্তু এ কথা সন্তুর বিশ্বাস হয়নি। তারপর একটা চৌকো তামার বাক্স থেকে পাওয়া গেল কণিষ্কের কাটা মুণ্ডু। কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, 'সন্তু, এটার আবিষ্কারক হিসেবে তোর নামও ইতিহাসে লেখা থাকবে।'

'সবুজ দ্বীপের রাজা' উপন্যাসের কাহিনি সুদূর আন্দামানে, জারোয়াদের দ্বীপে। সেখানে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বিখ্যাত বিপ্লবী গুণদা তালুকদারকে সঙ্গে পেলেন কাকাবাবুরা, যিনি আন্দামানের জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

'পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক'য় কাকাবাবুরা পৌঁছে গেছেন গোরখশেপ নামে একটা জায়গায়। সেখানকার একটা ছোট পাহাড়ের নাম কালাপাথর। সেই পাহাড়ে উঠলেই দেখা যায় এভারেস্টকে। কাকাবাবু বিলেত থেকে একটা দাঁত এনেছিলেন, দেখতে মানুষের দাঁতের মতো। সেটাও সঙ্গে এনেছেন কাচের বাক্সে ভরে। তারপর একটা গম্বুজ আর তুষারমানবদের নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড।

'কাকাবাবু ও এক ছদ্মবেশী' উপন্যাসে কাকাবাবুরা চলে যান মণিকরণ বলে হিমালয়ের কোলে একটি জায়গায়। সেখান থেকে উদ্ধার করলেন দেবতা ভূতেশ্বরের মূর্তি।

'মিশর রহস্য'য় কাকাবাবু একাই একটা কাজে দিল্লি গিয়েছিলেন। পরে সন্তুকে ডেকে পাঠালেন দিল্লি যেতে। তারপর সেখান থেকে সন্তুকে নিয়ে সুদূর মিশরে গিয়ে পৌঁছোলেন কাকাবাবু।

'ভূপাল রহস্য' উপন্যাসে নিপুদার সঙ্গে মিংমা আর সন্তু চলল ভোপালে। তারপরে ভীমবেঠকায় গিয়ে হাজির কাকাবাবুও।

'জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল' উপন্যাসের পটভূমি নাইরোবি। সেখান থেকে ওঁরা পৌঁছে গেলেন মাসাইমারায়।

'জঙ্গলগড়ের চাবি' উপন্যাসের পটভূমি ত্রিপুরার আগরতলা।

'কাকাবাবু হেরে গেলেন' উপন্যাসের বিষয় চমৎকারিত্বে অসাধারণ। ১৪৫৫ সালে গুটেনবার্গের ছাপাখানায় ছাপা বাইবেলের প্রথম কপি নিয়ে জমে ওঠে জমজমাট কাহিনি।

কালিকটের একটি খুব পুরোনো বাড়িতে পাঁচশো বছর আগের ভাস্কো-দা-গামার ভূত নিয়ে জমজমাট কাহিনি গড়ে উঠেছে 'কাকাবাবু ও চন্দনদস্যু'র।

আরব দেশের ভয়ঙ্কর খেলা উটের দৌড়। শিশুদের উটের পিঠে বেঁধে করা হয় এই দৌড়। এই খেলার জন্যে বাংলাদেশ থেকে একদল শিশুকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। এই নিয়েই গড়ে উঠেছে 'কাকাবাবু ও শিশুচোরের দল' উপন্যাসের কাহিনি।

এ ছাড়া অসমের জাটিঙ্গা পাখির খোঁজে কাকাবাবুরা হাজির হন অসমের জঙ্গলে, এক আশ্চর্য আলোর খোঁজে কাকাবাবু চলে যান কোচবিহারে, কাকদ্বীপে যাওয়ার পর এক ম্যাজিশিয়ান ভ্যানিশ করে দেয় জোজোকে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পায়ের তলায় সরষে ছিল, তিনি টইটই করে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন, আর সেসব বেড়ানোর অভিজ্ঞতার সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার মিশিয়ে লিখতেন সন্তু-কাকাবাবুর কাহিনি। তাই এইসব কাহিনির গায়ে কখনও একঘেয়েমির ছাপ লাগেনি। সবসময় পাঠক নতুন কাহিনির গন্ধে মশগুল হয়ে থাকতে পেরেছে। তাই তাঁর পাঠক উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত নতুন কী কাহিনি লিখবেন এবার। এবার কাকাবাবু কোথায় যাবেন অ্যাডভেঞ্চারে? সন্তু সঙ্গে থাকবে তো? আর জোজো? সেও যাবে তো এবার? তাঁর সুখপাঠ্য গদ্য পাঠকদের লোভাতুর করে রাখত সারা বছর।

'আনন্দমেলা' পত্রিকার কর্মী ছিলাম বলেই সন্তু-কাকাবাবুর তিরিশটিরও বেশি কাহিনির আমিই ছিলাম প্রথম পাঠক। সে এক আশ্চর্য রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। এমনকী, শেষ সন্তু-কাকাবাবুর কাহিনি 'গোলকধাঁধায় কাকাবাবু'রও আমি প্রথম পাঠক ছিলাম। সেটিও প্রকাশিত হয়েছে 'আনন্দমেলা' পত্রিকার ২০১২ সালের পূজাবার্ষিকীতে।

শুধুমাত্র বিপুল পাঠকপ্রিয়তার জন্যেই সন্তু-কাকাবাবুর কাহিনি নিয়ে সিনেমাও তৈরি হয়েছে— 'সবুজদ্বীপের রাজা', 'কাকাবাবুর হেরে গেলেন', 'সন্তু ও এক টুকরো চাঁদ', 'মিশর রহস্য'। অ্যানিমেশন ফিল্মও কম তৈরি হয়নি— 'পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক', 'জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল', 'বিজয়নগরের হিরে', 'কাকাবাবু ও বজ্রলামা', 'কাকাবাবু ও চন্দনদস্যু' কাহিনিগুলো। টেলিফিল্ম হয়েছে 'রাজবাড়ির রহস্য' ও 'কলকাতার জঙ্গলে', 'কাকাবাবু ও ছদ্মবেশী'র মতো চমৎকার কাহিনি নিয়ে। এ ছাড়া 'ভয়ংকর সুন্দর', 'মিশর রহস্য', 'সবুজ দ্বীপের রাজা'র মতো কাহিনি নিয়ে আঁকা হয়েছে কমিক স্ট্রিপও। একালে কিশোর ছেলেমেয়েরা আর বই পড়তে চায় না, এমন অনুযোগ কাকাবাবু-কাহিনির ক্ষেত্রে একেবারেই খাটে না। এত ভিডিয়ো গেম, এত কমিকস আর কার্টুন চ্যানেলের দৌরাত্ম্য সন্তু-কাকাবাবুর কাহিনিকে একটুও পিছনে ফেলতে পারেনি। বাংলা কিশোর সাহিত্যকে এখানেই জিতিয়ে দিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঁচে থাকার শেষ দিন পর্যন্ত কাকাবাবুর কাহিনি পড়ার আগ্রহ ছিল পাঠকের কাছে ছিল প্রায় অপ্রতিরোধ্য। শুধু কিশোররাই নয়, বড়রাও সমান কৌতূহলী পাঠক ছিলেন এইসব কাহিনির। একই সিরিজের উনচল্লিশটি কাহিনি পড়ার পরও তাই পাঠক তাকিয়ে থাকতেন তাঁর নতুন কাহিনির দিকে, এ কম কথা কী। এই মোহজাল থেকে এখনও কি বাংলা কিশোর সাহিত্যের পাঠক বেরিয়ে আসতে পেরেছেন? আর তো লেখা হবে না সন্তু-কাকাবাবুর কাহিনি। তবু মনে হয়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্যের পাঠক এখনও হয়তো শারদোৎসবে শিউলি আর কাশ ফুটলে, নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে পড়লে, তাঁরাও পুরোনো সন্তু-কাকাবাবুর সঙ্গী হয়ে পড়েন মনে-মনে।

দুর্দান্ত সাহসী, বিপদে হার-না-মানা সন্তু এবং নির্ভীক, মজাদার জোজো ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, অসীম মনোবল নিয়ে ন্যায়ের পক্ষে লড়াই করে যাওয়া, মানবদরদি, পৃথিবীর শুভাকাঙ্ক্ষী মায়াময় খোঁড়া মানুষটি এবং তাঁর স্রষ্টা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্যে বাংলা কিশোর সাহিত্য স্বপ্নের আসন পেতে রাখবে থাকবে চিরদিন।

কলকাতা বইমেলায় 'সমসাময়িক বাংলা'র স্টল নং ২৯৯

সেলুলয়েডে টিনটিন

বিবেক সেনগুপ্ত

২০১১-য় যখন জানা গেল, আমাদের সবার প্রিয় কমিক চরিত্র টিনটিন আসছে বড় পর্দায় এবং তা বানাচ্ছেন স্বয়ং স্টিভেন স্পিলবার্গ, বিশ্বের অগণিত টিনটিন অনুরাগী নড়েচড়ে বসল। প্রত্যাশার পারদ প্রায় আকাশ ছুঁই-ছুঁই। কেমন হতে চলেছে সেই ছবি? কোন গল্পটা নিয়ে ছবি করবেন প্রবাদপ্রতিম চলচ্চিত্রকার? আমরা দেখতে পাব তো আমাদের প্রিয় ক্যাপ্টেন হ্যাডককে? আর থম্পসন আর থমসন (বাংলায়, জনসন ও রনসন)? বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ২০১১-র শেষে মুক্তি পেল 'দি অ্যাডভেঞ্চারস অফ টিনটিন— সিক্রেট অব দি ইউনিকর্ন।' থ্রি-ডি অ্যানিমেশন ও স্পেশাল এফেক্টস-এর ঝাঁ চকচকে মোড়কে পরিবেশিত টিনটিন ও তার সঙ্গীসাথিদের পেয়ে মজে গেল ৮ থেকে ৮০-র টিনটিনপ্রেমীরা। হলিউডের হাত ধরে আন্তর্জাতিক আঙিনায় প্রথম পদার্পণ হলেও, ছোট-বড় পর্দায় টিনটিনের আগমন কিন্তু ঘটে গেছে বহু বছর আগেই।

গোড়ার কথা

নিজের সেরা সৃষ্টিকে পর্দায় নিয়ে আসার ব্যাপারে হার্জে উৎসাহী ছিলেন বরাবরই। টিনটিনকে নিয়ে চলচ্চিত্র বানানোর ভাবনাচিন্তা শুরু হয় চারের দশক থেকেই। জ্রত্র্ম স্কত্রখন্ডঅ নামক একটি ফিল্ম কোম্পানি হার্জের সাদা-কালো কমিকসের কয়েকটি গল্পের ওপর একটি সিরিজ বার করে। একই বছর ক্লদ মিসোন নামে এক প্রযোজক টিনটিন পত্রিকার বিজ্ঞাপনের জন্য তৈরি করেন একটি পাপেট অ্যানিমেশন। সেই শুরু।

তবে আক্ষরিক অর্থে টিনটিনের পর্দায় প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটল ১৯৪৭ সালে এই ক্লদ মিসোন-এর হাত ধরেই। হার্জের 'কাঁকড়া রহস্য' গল্পটি নিয়ে বানানো ৫৪ মিনিটের সাদা-কালো স্টপ-মোশন অ্যানিমেশনে টিভির পর্দায় প্রথম দেখা গেল টিনটিনকে। ছবিটির পরিচালক ছিলেন উইলফ্রেড বুচেরি। খুবই স্বল্প বাজেটের এই ছবিতে স্বাভাবিকভাবেই সেভাবে তুলে ধরা যায়নি অ্যাকশন মুহূর্তগুলো। কখনও উড়ন্ত এরোপ্লেনের মাথায় বাঁধা তার দৃশ্যমান তো কখনও গভীর সমুদ্র দেখাতে জলের ট্যাঙ্কে ভাসমান মিনিয়েচার জাহাজ খুব সহজেই চোখে লাগে। তবুও সব মিলিয়ে হার্জের মূল কাহিনি একেবারে অপরিবর্তিত রেখে স্টপ মোশন-এর মাধ্যমে যথেষ্ট সফলভাবে দেখাতে পেরেছেন উইলফ্রেড। ডিম্বাকৃতির মিনিয়েচার চরিত্রের মডেলগুকেও চিনে নিতে অসুবিধে হয়নি। আধুনিক টেকনোলজির সাহায্য না পেয়েও কিছু ক্লাসিক মুহূর্ত, বিশেষ করে সাহারা মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত ক্যাপ্টেনের হ্যালুসিনেশনে টিনটিনের হঠাৎ বড়সড় শ্যাম্পেনের বোতলে পরিণত হওয়া এনে দেয় এক অন্য মাত্রা।

তবে এই ছবি তৈরি করাকালীন উইলফ্রেড সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর ছবির প্রিন্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়। ততদিনে ছবি তৈরি শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং একবারই মাত্র শো-তে এই ছবি দেখানো হয়। তখনকার

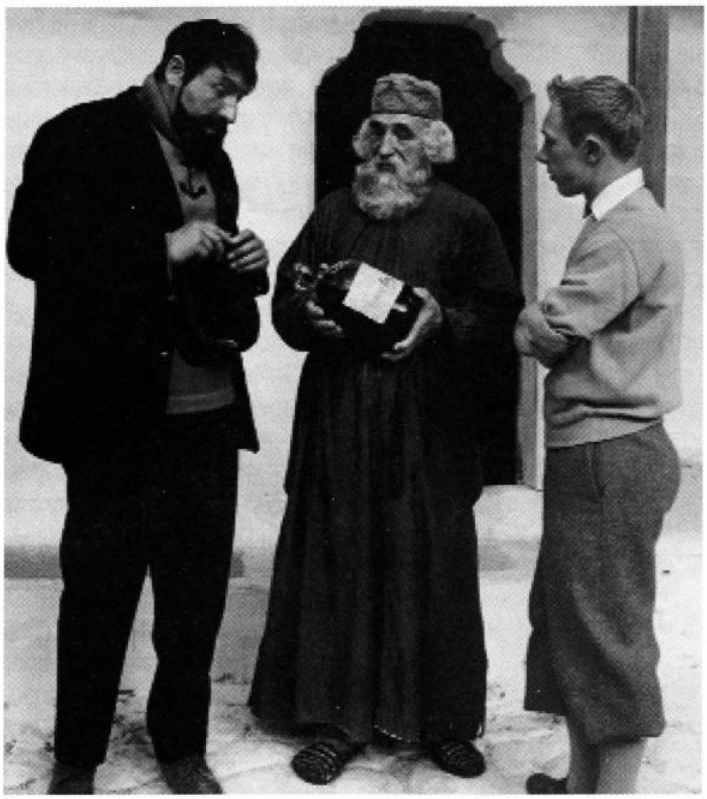

দিনে বহু ক্ষেত্রে প্রিন্ট নষ্ট করে ফেলা হত। সৌভাগ্যবশত এ ছবির প্রিন্টটি বেঁচে যায়, যার একটিমাত্র কপি এখন সংরক্ষিত আছে রয়্যাল বেলজিয়ান ফিল্ম আর্কাইভ-এ। ব্রাসেলস-এ টিনটিন ফেস্টিভ্যাল-এ বারকয়েক প্রদর্শিত হয়েছে এই ফিল্মটি। টিনটিন-ভক্তদের জন্য সুখবর যে ইউ টিউব-এ খোঁজ করলে এ ছবিটি দেখতে পাওয়া যাবে।

(তথ্যসূত্র- টিনটিন অরিজিন— অ্যান্টনি নার্ড, ২০১১)।

সেই সময় অ্যানিমেশন মানেই ছিল ওয়াল্ট ডিজনি। একের পর এক ডিজনির অ্যানিমেশন ছবি মুক্তি পাচ্ছে আর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বক্স অফিসের সাফল্য। হার্জে ডিজনির সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার ও টিনটিনের অ্যাডভেঞ্চারগুলোর অ্যানিমেশন বানানোর ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তা আর বাস্তবায়িত হয়নি।

প্রথম অ্যানিমেটেড টিভি সিরিজ

১৯৫৫ সালে টিনটিন কমিকসের প্রকাশক লোম্বার্ড-এর অধিকর্তা রেমন্ড লেব্লাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন 'বেলভিশন অ্যানিমেশন স্টুডিয়ো'। ফ্রান্স ও বেলজিয়ান টিভির জন্য টিনটিনের গল্পগুলিতে ছোট ছোট পর্বে ভাগ করে অ্যানিমেশন বানানো শুরু করে বেলভিশন। ৫ মিনিটের এক একটি পর্ব নিয়ে মোট ১০৪টি এপিসোড তৈরি হয়েছিল মূলত ফরাসি ভাষায়। 'ওটোকারে রাজদণ্ড', 'ক্যালকুলাসের কাণ্ড', 'কান ভাঙা মূর্তি', 'চাঁদে টিনটিন', 'কৃষ্ণদ্বীপের রহস্য'— একের পর এক অ্যানিমেশন প্রকাশিত হয়। এই সিরিজ তেমন জনপ্রিয় হয়নি এবং হার্জে নিজেও এই অ্যানিমেশন নিয়ে খুশি ছিলেন না। বেলভিশনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রিলিজ ছিল ১৯৭২ সালের 'Lake of Sharks' অর্থাৎ 'হাঙর হ্রদের বিভীষিকা'। তবে এ ছবিটি হার্জের নিজের কোনও গল্পের থেকে নয়— এর কাহিনিকার ছিলেন হার্জের বন্ধু মাইকেল (গ্রেগ) রেনার। পরবর্তীকালে কমিকসের আকারে প্রকাশিত হয় এই গল্পটি।

বর্তমানে টিনটিনের যে অ্যানিমেশন সিরিজ-এর সিডি দোকানে মেলে, সেগুলি তৈরি হয়েছিল আরও পরে। নেলভানা ও এলিপস কোম্পানির প্রযোজনায় ও হার্জে ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ১৯৯১-৯২-এ মোট ৩৯টি ২২ মিনিটের এপিসোডে প্রকাশিত হয় এই সিরিজটি। একমাত্র 'সোভিয়েত দেশে টিনটিন', 'কঙ্গোয় টিনটিন' ও 'অ্যাল্‌ফ আর্ট' বাদ দিয়ে প্রায় সব ক'টি গল্পেরই অ্যানিমেশন প্রকাশিত হয়েছে এবং বলা যেতে পারে, এই প্রথম হার্জের গল্পগুলিকে সার্থকভাবে তুলে ধরা গেল টিভির পর্দায়। (তথ্যসূত্র- টিনটিন— দ্য পকেট এসেনশিয়াল, ২০০২)

মঞ্চে আবির্ভাব

এবার একটু অন্য দিকে তাকানো যাক। শুধুমাত্র কমিকসের পাতায় ও টিভি অ্যানিমেশনেই থেমে থাকেনি টিনটিনের জয়যাত্রা। চারের দশক থেকেই নিয়মিত থিয়েটারের মঞ্চে আবির্ভাব ঘটে গেছে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় তরুণ রিপোর্টারের। হার্জে নিজেই দু'টি প্লে-র স্ক্রিপ্ট লিখেছিলেন। এর মধ্যে প্রথমটি পল রিগা-র নির্দেশনায় 'Tintin in Indies: The Mystery of Blue Diamond' (১৯৪১), যা আসলে 'ফারাও-এর চুরুট' গল্পের শেষের অংশটুকু। যেখানে টিনটিনকে আসতে হয়েছিল ভারতে, রাজা গাইপাজামা-র আমন্ত্রণে। ১৯৪১-এর এপ্রিল-মে মাসে ব্রাসেলসের থিয়েটার দে ভালারিস-এ মঞ্চস্থ হয় এই প্লে-টি। এবং অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে টিনটিনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জেন রুবেন্স নামক এক তরুণী! অর্থাৎ টিনটিন চরিত্রে প্রথম রক্তমাংসের অভিনেতা আসলে একজন অভিনেত্রী।

এর পর হার্জে ও পল রিগা একসঙ্গে আরও একটি প্লে মঞ্চস্থ করেন ওই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে ক্রিসমাসের সময়। 'The Disappearance of Mr. Boullock'-এর স্ক্রিপ্টও লিখেছিলেন হার্জে নিজেই। এই প্লে-তে রুবেন্স নন, টিনটিনের ভূমিকায় দেখা যায় ৯ বছরের শিশুশিল্পী রোনাল্ড রাভেজকে।

পরবর্তীকালে টিনটিনকে নিয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে 'গ্রেট আমেরিকান অ্যাডভেঞ্চার' (১৯৭৬), 'ব্ল্যাক আইল্যান্ড' (১৯৮০) ও 'কাস্তাফিওর

১৯৪১-এর এপ্রিল-মে মাসে ব্রাসেলসের থিয়েটার দে ভালারিস-এ মঞ্চস্থ হয় এই প্লে-টি। এবং অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে টিনটিনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জেন রুবেন্স নামক এক তরুণী! অর্থাৎ টিনটিন চরিত্রে প্রথম রক্তমাংসের অভিনেতা আসলে একজন অভিনেত্রী। পরে টিনটিনের ভূমিকায় দেখা যায় ৯ বছরের শিশুশিল্পী রোনাল্ড রাভেজকে।

এমারেল্ড' এবং দু'টি মিউজিক্যাল 'টেম্পল অফ সান' ও 'টিনটিন ইন টিবেট'। এর মধ্যে তুমুল জনপ্রিয়তা পায় 'TheTemple of Sun' (হার্জের গল্প 'সূর্যদেবের বন্দি' অবলম্বনে)। ডাচ ও ফরাসি ভাষায় এই মিউজিক্যালটি চলেছিল ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ পর্যন্ত। ৩৪ বছর বয়সি টম ভন ল্যাভুইট অভিনয় করেছিলেন টিনটিনের চরিত্রে। মূল কাহিনি অপরিবর্তিত রেখে তৈরি হল ব্যয়বহুল সেট। সূর্যমন্দির পৌঁছোতে টিনটিন, হ্যাডক ও জেরিনোকে পার হতে হয়েছিল দুর্গম পাহাড়, লড়াই করতে হয়েছে ইগলের সঙ্গে এবং সব শেষে দড়ির সাহায্যে ঝুলে বিপজ্জনকভাবে পার হতে হয়েছে পাহাড়ি জলপ্রপাত। এই জলপ্রপাতটিকে ঠিকঠাক মঞ্চে দেখানোর জন্য প্রয়োজন হত প্রায় ৩.৫ টন জল প্রতি শো-তে। এমনকী ইনকা সভ্যতার রীতিনীতিও সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরা হয়েছিল এই প্লে-তে। প্রচুর যান্ত্রিক কারিকুরি ও ব্যয়বহুল সেট ডিজাইনের খরচ সামাল দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, তাই খুব তাড়াতাড়ি প্রযোজকষ্টথত্বত্রম্প ঋদ্রঋকে শো বন্ধ করতে হয়। তুমুল জনপ্রিয়তা পেলেও আর ভবিষ্যতে এই শো করা সম্ভব হয়নি। আর তাই এমন চোখ কপালে তোলা মাস্টারপিস দেখার সৌভাগ্য হয়নি বহু টিনটিনপ্রেমীর।

শেষবারের মতো টিনটিনকে মঞ্চে দেখা গেল ২০০৫-০৬-এর লন্ডনের বারবিক্যান-এ। 'তিব্বতে টিনটিন' মিউজিক্যালটিতেও মূল কাহিনির খুব বেশি পরিবর্তন করা হয়নি। রুফাস নরিস নির্দেশিত এই প্লে-তে টিনটিনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রাসেল টোভে।

প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র

কমিকসের পাতায় টিনটিনের বিপুল সাফল্য বহু পরিচালক-প্রযোজককেই টিনটিন নিয়ে ছবি বানাতে উৎসাহী করে তুলেছিল তা বলাই বাহুল্য। যেমন কস্তো। যিনি 'লাল বোম্বেটের গুপ্তধন' নিয়ে ছবি বানাবেন বলে তো একটা প্রমাণ মাপের ক্যালকুলাসের হাঙরাকৃতির ডুবোজাহাজের মডেলই বানিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু টিনটিনকে লাইভ অ্যাকশনে আনার ব্যাপারে হার্জের ছিল বড়ই অনীহা। শেষ পর্যন্ত আন্দ্রে ব্যারেট নামে এক তরুণ প্রযোজক হার্জেকে রাজি করাতে সক্ষম হন।

ব্যারেট লিখতে চাইলেন আদ্যপ্রান্ত এক নতুন কাহিনি। অপর দিকে হার্জের ইচ্ছে, তাঁর গল্পগুলির থেকেই কোনও একটির চলচ্চিত্রায়ণ হোক। অবশেষে অনেক আলোচনার মধ্যে দিয়ে ঠিক হল ইস্তানবুলের প্রেক্ষাপটে নতুন গল্পের প্লট। হার্জের তত্ত্বাবধানে স্ক্রিপ্ট লিখলেন আন্দ্রে ও রেমো ফোরলানি। কিন্তু গোল বাধল, টিনটিনের চরিত্রে অভিনয় করবেন কে? দেওয়া হল বড়সড় বিজ্ঞাপন। আন্দ্রে অডিশন নিলেন প্রায় শ'খানেক অভিনেতার, কিন্তু কাউকেই মনঃপূত হল না। অবশেষে এক সমুদ্রসৈকতে আবিষ্কার করা গেল জাঁ পিয়ের ট্যালবটকে।

অবশেষে ১৯৬১-তে ফরাসি ভাষায় (এবং পরে ইংরেজিতে ডাব করে) মুক্তি পেল 'টিনটিন অ্যান্ড দ্য সিক্রেট অফ গোল্ডেন ফ্লিস'। ৯৩ মিনিটের রঙিন এই ছবিতে জাঁ পিয়ের ছাড়া ক্যাপ্টেনের ভূমিকায় দেখা গেল জর্জেস উইলসনকে। টিনটিনকে নিয়ে বড় পর্দায় এটি প্রথম ছবি বলেই কিছু সাড়া জাগলেও হার্জের আঁকা কমিকসের পাতার সেই ম্যাজিক পর্দায় পেল না টিনটিন অনুরাগীরা।

এর তিন বছর পর নিটনিকে নিয়ে আরও একটি ছবি বানান আন্দ্রে। 'Tintin and the Blue Oranges' নামের এই ছবিটি মুক্ত পায় ১৯৬৪-তে। এবার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ফিলিপ কন্ড্রোয়ার। টিনটিনের ভূমিকায় আবার দেখা গেল জাঁ পিয়েরকে। কিন্তু বক্স অফিসের সাফল্য এবারেও জুটল না। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই ছবির স্ক্রিনপ্লে লিখেছিলেন আন্দ্রে ও রেমোর সঙ্গে আরেকজনও। তিনি নিজেও কমিকস জগতের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। আরেক পৃথিবীবিখ্যাত ফরাসি কমিকস 'অ্যাস্টেরিক্স'-এর কাহিনিকার রেনে গোচিনি স্বয়ং।

টিনটিন ও স্পিলবার্গের যোগাযোগ

একজন ইউরোপীয় কমিকসের জগতে অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র, অপরজন বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্রকার। কীভাবে হল দু'জনের প্রথম যোগাযোগ? কাকতালীয় হলেও এর পিছনেও আছে এক মজার ঘটনা।

তখন ১৯৮১ সাল। স্পিলবার্গের ছবি 'ইন্ডিয়ানা জোন্স'-এর প্রথম পর্ব 'রেইডার্স অব দ্য লস্ট আর্ক' সবেমাত্র মুক্তি পেয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই সুপারহিট। সারা পৃথিবীর পত্রপত্রিকায় ছবিটির ভালো ভালো

রিভিউ বেরোচ্ছে। এর ফাঁকেই ফরাসি কিছু পত্রিকায় বেরোনো রিভিউ স্পিলবার্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ইংল্যান্ডে টেলিগ্রাফ পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্পিলবার্গ জানালেন নিজের মুখেই— 'আমি ফরাসি জানি না। কিন্তু ফরাসি পত্রিকার 'রেইডার্স অব দ্য লস্ট আর্ক'-এর রিভিউতে বারবারই 'টিনটিন' শব্দটি আমার চোখে পড়ে। কৌতূহলবশত লেখাটির অনুবাদ করে যা দাঁড়াল— আমার এই ছবি নাকি নিঃসন্দেহে নামকরা এক বেলজিয়ান কমিকস শিল্পী হার্জের প্রতি হোমেজ, কারণ 'ইন্ডিয়ানা জোন্স' নাকি হার্জের অমর সৃষ্টি টিনটিন থেকেই অনুপ্রাণিত।'

এর পর তো আর কৌতূহল দমন করা যায় না। সহকারীর মারফত তিনি জোগাড় করলেন একটি টিনটিনের কমিকস (খুব সম্ভবত 'মমির অভিশাপ')। ফরাসি ভাষা বোধগম্য না হলেও Ligne Claire Style (ফরাসি শব্দ, যার অর্থ Clear line)-এ আঁকা ছবি, চরিত্রের বর্ণনা ও প্যানেলের ডিটেলিং মুগ্ধ করল স্পিলবার্গকে। ছবি আর গল্পের ছাঁচ দেখে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না, এই অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় রিপোর্টারের সঙ্গে কেনই বা তাঁর 'ইন্ডিয়ানা জোন্স'-এর এই তুলনা। এর পর আস্তে আস্তে তিনি পড়া শুরু করলেন টিনটিনের বাকি কমিকসগুলি। নিজের অজান্তেই হয়ে উঠলেন টিনটিনের এক বড় ফ্যান। স্বাভাবিকভাবেই টিনটিনকে নিয়ে ছবি বানাবার উৎসাহ প্রকাশ করেন। হার্জে নিজেও স্পিলবার্গের ছবির ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং মনে করতেন টিনটিনকে পর্দায় যথাযথভাবে একমাত্র স্পিলবার্গই নিয়ে আসতে পারবেন।

১৯৮২ সালে টিনটিনের ছবি বানানোর স্বত্ব পেলেন স্পিলবার্গ। একটি প্রথম স্ক্রিনপ্লের খসড়া বানিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন হার্জেকে। তবে সে স্ক্রিপ্ট মূল কাহিনি থেকে সরে এসে বড্ড হলিউডি অ্যাকশনে ঠাসা বলে হার্জে সম্মতি দিয়ে দ্বিধা বোধ করেন। স্পিলবার্গ ব্রাসেলস-এ গিয়ে সরাসরি হার্জের সঙ্গে বসে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন ঠিক হলেও, ঠিক সেই সময়ই হার্জে মারা যান। তাই ছবির ব্যাপারটা আর এগোতে পারেনি। অগত্যা স্পিলবার্গ মনোনিবেশ করলেন তাঁর পরের 'ইন্ডিয়ানা জোন্স'-এর ছবি তৈরি নিয়ে।

বহু বছর পর ২০০২-এ তিনি আবার টিনটিনকে নিয়ে ছবি করার ইচ্ছে পুনর্বিবেচনা করেন। এবং অবশেষে তাঁর পরিচালনায় ও পিটার জ্যাকসনের প্রযোজনায় টিনটিন ফিরে এল বড় পর্দায় একেবারে হলিউডে।

প্রযুক্তি ও স্পেশাল এফেক্টের জাদু

২০১১-য় মুক্তি পেলেও এই ছবির প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ২০০৪ সাল থেকেই, যখন স্পিলবার্গ 'লর্ড অব দ্য রিংস' ছবির পরিচালক পিটার জ্যাকসনের সঙ্গে যৌথভাবে টিনটিনের অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে তিন ছবির ট্রিলজি বানানোর পরিকল্পনা করেন। বাদ সাধল তিন-চারের দশকের প্রেক্ষাপট ও হার্জের আঁকা চরিত্রগুলির বর্ণনা। কমিকসের পাতার সেই জাদু যথাযথভাবে পর্দায় তুলে আনতে সাহায্য নিলেন অত্যাধুনিক কম্পিউটার অ্যানিমেশন প্রযুক্তির। ঠিক হল ছবিটি হবে থ্রি-ডি-তে। শুটিং শুরু হল জ্যাকসনের 'Weta' স্পেশাল এফেক্ট স্টুডিয়োতে। ২০০ সদস্যের দল প্রবীণ স্পেশাল এফেক্ট সুপারভাইজর জো লেত্তেরি ও

রিচার্ড টেলরের তত্ত্বাবধানে শুরু করল ৩৬০০ পারফর্মেন্স ক্যাপচার। ব্যবহৃত হল ভার্চুয়াল ক্যামেরা। বিশেষ ধরনের পোশাকে সজ্জিত হয়ে অভিনেতারা অভিনয় করেছেন আর তা সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাপচার হয়ে সেই ক্যামেরার মাধ্যমে সিজি-তে তৈরি থ্রি-ডি মডেলকে ফিড করিয়ে রিল টাইমে। টিভি পর্দায় ফেলে দেখে ফেলা যাচ্ছে অ্যানিমেশনের ফুটেজ। এই ক্যামেরার প্রযুক্তি সম্প্রতি অ্যানিমেশনের জগতে এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

চরিত্রদের চোখ-মুখের এক্সপ্রেশনকে নিখুঁতভাবে তুলে আনতে ব্যবহার হল 'ইমেজ বেসড ফেশিয়াল পারফর্মেন্স ক্যাপচার'। অভিনেতাদের মাথার ওপর আটকানো ক্যামেরাতে ধরে রাখা হয়েছে চোখ-মুখ-ঠোঁটের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভঙ্গি। (তথ্যসূত্র- The Art of the Adventures of Tintin, ক্রিস গুস, ওয়েটা অ্যানিমেশন) ছবিতে টিনটিনের চরিত্রে নেপথ্যে কণ্ঠ দিয়েছেন জেমি বেল। এক বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন জেমস বন্ড-খ্যাত ড্যানিয়েল ক্রেগ।

এককথায়, অ্যানিমেশনের ইতিহাসে স্পিলবার্গের এই ছবি হয়ে থাকবে এক অন্যতম দৃষ্টান্ত। আরও দু'টি ছবি তৈরি হবে খুব শীঘ্রই। খুব সম্ভবত পরের ছবিটি মুক্তি পাবে ২০১৫-র ডিসেম্বরে, যেটি পরিচালনা করবেন পিটার জ্যাকসন। কোন গল্পের ওপর তৈরি হবে ছবিটি তা নিয়ে মুখ খোলেননি স্পিলবার্গ বা জ্যাকসন কেউই। তবে টিনটিনপ্রেমীদের উত্তেজনা এখন থেকেই তুঙ্গে। কেমন হবে সেই ছবি? হয়তো আমরা দেখতে পাব আরও উন্নততর ও চমকপ্রদ প্রযুক্তির জাদু। শুধু তার জন্য ধৈর্য ধরে থাকতে হবে আরও দু'টি বছর।

১৯৮২ সালে টিনটিনের ছবি বানানোর স্বত্ব পেলেন স্পিলবার্গ। একটি প্রথম স্ক্রিনপ্লের খসড়া বানিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন হার্জেকে। তবে সে স্ক্রিপ্ট মূল কাহিনি থেকে সরে এসে বড্ড হলিউডি অ্যাকশনে ঠাসা বলে হার্জে সম্মতি দিয়ে দ্বিধা বোধ করেন। এককথায়, অ্যানিমেশনের ইতিহাসে স্পিলবার্গের এই ছবি হয়ে থাকবে এক অন্যতম দৃষ্টান্ত।

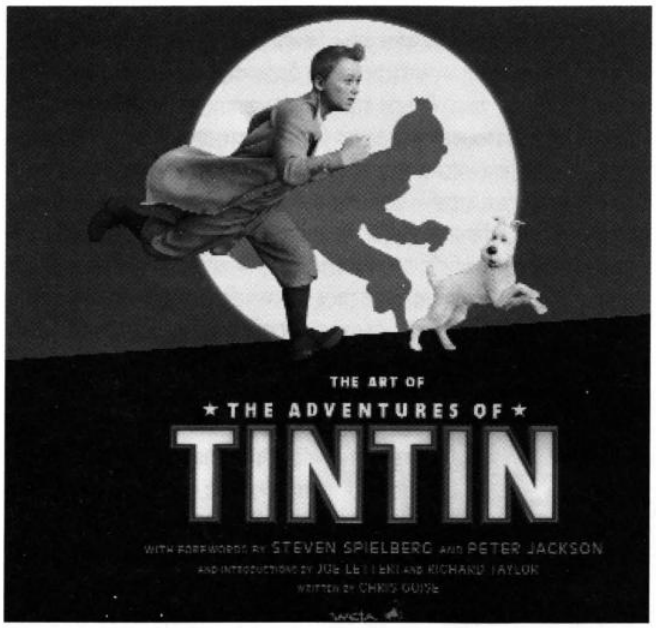

টিনটিনের অভিযান

হিমাদ্রি ভট্টাচার্য

ওই বুঝি পেল্লায় বাহারি লোহার গেটটা সামান্য ফাঁক হল! মোরাম বিছোনো পথ ধরে এগিয়ে গেলেই সবুজ ঘাসে ঢাকা লনের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাসাদ মার্লিনস্পাইক হল। মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে সোজা উঠলেই বিশাল কাঠের দরজা। ডান ধারে কলিং বেল। বাজালেই দরজা খুলে দেবে কালো কোট পরা ফিটফাট বাটলার নেস্টর। টাকমাথা, কর্তব্যপরায়ণ মুখ— সংযত কিন্তু অনুভূতিপ্রবণ। কাকে চাই? কর্তাকে? কর্তা বুঝি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। নাবিক মানুষ— জীবন কেটেছে সমুদ্রে-সমুদ্রে। আজ না হয় পূর্বপুরুষের গুপ্তধনের কল্যাণে হাতে দুটো পয়সা হয়েছে, কিন্তু তা-ই বলে কি ব্রিচেস পরে, চোখে মনোকল লাগিয়ে ফুলবাবুটি সেজে ছড়ি হাতে ঘোড়া ছোটানো পোষায়? মাঝে-মাঝেই তাই একলা ঘোড়া তড়িঘড়ি ফিরে আসে বাড়িতে— হতচ্ছাড়া জানোয়ার! আর ছিটকে পড়া কর্তা কোমর চেপে গজগজ করতে-করতে খানিক বাদেই পিছুপিছু ফেরেন। ধকল সামলানোর জন্য তখন দু-এক পাত্র লক লোমন্ড হুইস্কি তো চাইই চাই! সন্ধ্যায় না হয় যাওয়া যাবে থিয়েটারে। ফকির রাগডালাম আর তার শিষ্যা জামিলার সম্মোহনের খেলা, জাদুসম্রাট ব্রুনোর জলকে হুইস্কি বানিয়ে দেওয়ার আশ্চর্য কেরামতি, রামন জারাটের ছোরর খেলা— সন্ধ্যাটা ভালোই কাটবে।

নিরিবিলি শহরতলি মার্লিনশায়ার। ইংল্যান্ডের অপরূপ কান্ট্রিসাইড; সবুজে সবুজ। মেঠো পথ ছবির মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে গ্রামের দিকে। দূর থেকেই দেখা যায় গ্রামের ঘরবাড়ি আর স্থানীয় গির্জার চূড়া। পথের দু'ধারে সাজানো চাষের খেত, সবুজ মাঠ আর বড়-বড় গাছপালা। গাছে-গাছে অগুনতি পাখি; পায়ে-চলা পথের ধারে গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে পড়ে বুনো খরগোশ। গ্রামে থাকে কসাই কাট্‌স, রাজমিস্ত্রি বোল্ট, কাঠুরে চার্লি... কিছু দূরে রয়েছে একটা লাল ফোন বুথ। তবে ফোনে লাইন পাওয়া এখানে বড়ই দুর্ঘট। প্রায়ই কসাই কাট্‌সের ফোন নম্বর ৪৩১ আর মার্লিনস্পাইকের ফোন নম্বর ৪২১-এ কাটাকুটি লেগে যায়। সে এক বিড়ম্বনা!

লন্ডন থেকে ট্রেনে চেপে ছোট্ট স্টেশনে নেমে গ্রামের রাস্তা দিয়ে খানিকটা হেঁটে এলেই বাঁ হাতে পড়বে উঁচু হলুদ পাঁচিলে ঘেরা মার্লিনস্পাইক হল। প্রশস্ত বাগান। পিছনে বয়ে চলেছে তিরতিরে এক ছোট্ট নদী। এমন নিরিবিলিতে জীবন কাটাতে কার না মন চায়? লন্ডনের গণ্ডি বাঁধা জীবন ছেড়ে টিনটিনও তাই প্রায়ই চলে আসে মার্লিনস্পাইক হলে দু-একটা দিন কাটিয়ে যেতে।

আমরা যারা ছোটবেলা থেকেই টিনটিনের দুঃসাহসিক অভিযানগুলি পড়ে বড় হয়েছি, তারা সবাই মনে মনে বানিয়ে নিয়েছি টিনটিনকেন্দ্রিক এক আশ্চর্য কল্পলোক। জর্জেস প্রসপার রেমি বা হার্জে তেইশখানা বইয়ে গোটা ছয়েক প্রধান চরিত্র অবলম্বন করে যে মায়াময় জগৎ সৃষ্টি করে গেছেন, তার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে কমই আছে। মানুষ যেমন জীবনের নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে, ভুল করে, ভুল শুধরে, শিখে আর বুঝে, হাতড়ে-হাতড়ে সাবালক হয়— তেইশটি বইয়ের এই সিরিজে তেমনই তিলে-তিলে, নানা পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে সেই জগৎ— যে কোনও টিনটিনপ্রেমীর মনেই আজ যা দোলা জাগায়। সোভিয়েত দেশ বা কঙ্গোর প্রাথমিক অভিযান দু'টি পেরিয়ে আমেরিকায় আমরা প্রথম আমাদের চেনা টিনটিনকে পাই। তবে গল্প ফাঁদার মুনশিয়ানা তখনও লেখকের আয়ত্তে আসেনি। পরবর্তী পাঁচখানা বইয়ে ধীরে ধীরে দানা বাঁধে হার্জের নিজস্ব করণকৌশল। 'ফারাওয়ের চুরুট', 'নীলকমল', 'কানভাঙা মূর্তি'— এই অভিযানগুলি হার্জের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক ন্যায়, নীতিবোধ, বিদ্রুপ ও কৌতুকদৃষ্টি গড়ে তোলার প্রাথমিক পদক্ষেপ। 'কৃষ্ণদ্বীপের রহস্য' ও 'অটোকারের রাজদণ্ড'-এ হার্জের শৈলী পূর্ণতা লাভ করে। বস্তুত, কৃষ্ণদ্বীপের টানটান ঘটনাপ্রবাহ ও তীব্র হিউমার আর অটোকারের গবেষণাধর্মী ইতিহাসচেতনা ও প্লট নির্মিতির ঠাসবুনট— দুইয়ে মিলে যেন পরবর্তী বিখ্যাত অভিযানগুলির সারাৎসার।

এর পরের দু'টি বইয়ে চরিত্রচিত্রণ নিয়ে বিবিধ নিরীক্ষার ছাপ দেখা যায়। 'কাঁকড়া রহস্য'-এ ক্যাপ্টেন হ্যাডকের প্রবেশ। তবে বদমেজাজি এই নাবিকটিকে ঠিক কীভাবে তিনি ব্যবহার করবেন, তা নিয়ে হার্জে তখনও যেন দ্বিধায় ছিলেন। পরের বই 'আশ্চর্য উল্কা'য় তাই হ্যাডক থাকলেও অভিযানের কেন্দ্রে কেবল টিনটিনেরই একক অধিষ্ঠান। এতটাই, যে এ বইয়ের প্রচ্ছদেও ঠাঁই মেলে না হ্যাডকের। এমন ঘটনা আর মাত্র একবারই ঘটেছে ('লাল বোম্বেটের গুপ্তধন'-এর প্রচ্ছদে)।

তবে দ্রুতই এই দ্বিধা কাটিয়ে ওঠেন হার্জে। 'আশ্চর্য উল্কা'য় হ্যাডককে কিছুটা অবহেলা করবার ক্ষতিপূরণ হিসাবেই যেন পরের বইয়ের প্রচ্ছদে এবং কাহিনিতে একজোড়া হ্যাডকের আমদানি ঘটালেন তিনি। 'বোম্বেটে জাহাজ' এবং তার দ্বিতীয় পর্ব 'লাল বোম্বেটের গুপ্তধন'— এই দুটি বইয়ের কেন্দ্রস্থলে রাখলেন ক্যাপ্টেন ও তাঁর ঐতিহাসিক পূর্বপুরুষের কীর্তিকলাপ। নাটকীয়তায় তা এতটাই আকর্ষক যে বিশ্বখ্যাত পরিচালক টিনটিন নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের সূত্রে এই প্লটটিকেই তাঁর কাহিনির কেন্দ্রে রাখেন। এই যুগ্ম অভিযানের দ্বিতীয়টিতেই প্রফেসর ক্যালকুলাসের আবির্ভাব। যদিও আলাভোলা মানবদরদি বৈজ্ঞানিকের মডেলটি নিয়ে হার্জে কিন্তু অনেকদিন ধরেই নাড়াচাড়া করছিলেন। 'ফারাওয়ের চুরুট'-এ মিশর বিশেষজ্ঞ ডঃ সোফোক্লিস সার্কোফেগাস, 'নীলকমল'-এ উন্মাদ রোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ফ্যাং সি ইং, 'কানভাঙা মূর্তি'তে অভিযাত্রী রিজওয়েল, 'অটোকারের রাজদণ্ড'-এ প্রফেসর হেক্টর অ্যালেমবিক, এবং 'আশ্চর্য উল্কা'য় প্রফেসর ডেসিমাস ফসটল— এই

সবগুলি চরিত্রই প্রফেসর কাথবার্ট ক্যালকুলাসের পূর্বসূরি। বিশেষত 'আশ্চর্য উল্কা'য় কল্পবিজ্ঞানকেন্দ্রিক অ্যাডভেঞ্চারের সার্থক ব্যবহার জুল ভের্নের রচনার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। পরবর্তী দু'টি কাহিনি 'মমির অভিশাপ' আর 'সূর্যদেবের বন্দি'তে প্রফেসর ক্যালকুলাসের অপহরণ কেন্দ্রীয় স্থান পায়। 'কালো সোনার দেশে'তে প্রফেসর অন্তরালে থাকলেও পেট্রোলে বিস্ফোরণ থামাতে অগ্রণী ভূমিকা নেন। আর এর পরের তিনটি বইয়ে তো ক্যালকুলাসই কেন্দ্রীয় চরিত্র— 'চন্দ্রলোকে অভিযান', 'চাঁদে টিনটিন' আর 'ক্যালকুলাসের কাণ্ড'। এর পর 'লোহিত সাগরের হাঙর', 'তিব্বতে টিনটিন', 'পান্না কোথায়' আর 'ফ্লাইট ৭১৪' বাদ দিয়ে আবার 'বিপ্লবীদের দঙ্গলে'তে প্রফেসরের উদ্ভাবনই জেনারেল আলকাজারকে ক্ষমতা দখল করতে সাহায্য করে। এই পর্যায়ের অভিযানগুলির মধ্যে 'তিব্বতে টিনটিন' ও 'পান্না কোথায়' সর্বতোভাবেই আলাদা। প্রথমটিতে তীব্র মানবিক আবেগ-অনুভূতি ও দ্বিতীয়টিতে পারিবারিক রস এবং স্নিগ্ধ কৌতুকের জোয়ার দেখা যায়।

ওই বুঝি দরজা খুলল নেস্টর। মার্লিনস্পাইক হলের সঙ্গে এই মানুষটি এক অচ্ছেদ্য বাঁধনে জড়িয়ে আছে। ক্যাপ্টেনের ঢিলেঢালা জীবনযাত্রা সামলানো ছাড়াও বিয়াঙ্কা ক্যাস্টাফিয়োরার মতো সেলেব্রিটির আবদার মেটানো, সাংবাদিক বা টেলিভিশনকর্মীদের উৎপাত ঠেকানো, এত বড় বাড়ির মেরামত, দেখভাল— সবকিছুই সে অনায়াসে ঠান্ডা মাথায় সামলায়। নেস্টর অবশ্য মার্লিনস্পাইকে কাজও করছে, বহু বছর; পুরোনো মালিক বার্ডভাইদের আমল থেকেই। কেবল একটাই দুঃখ তার। এমন সাজানো বাড়ির বাসিন্দারা বাড়িতে থাকেই বা ক'দিন? বলা-কওয়া নেই, হুটপাট বেরিয়ে পড়ে বিশ্বভ্রমণে! আর মেজাজি মনিবের মর্জি বুঝে কাজ করাও কি কম ঝক্কি? অবশ্য মিঃ টিনটিন থাকলে আলাদা কথা— কর্তাকে একদম ঠান্ডা করে রাখে। অমন ডাকাবুকো ছেলেটা, অথচ কী ভদ্র আর বুঝদার। তামাম দুনিয়ার বদমাশদের টিট করেছে। দমন করেছে হরেক কিসিমের অপরাধ।

অপরাধ দমনের সূত্রে সত্যিই টিনটিনকে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মধ্যে ফেলেছেন হার্জে— তবে তার মধ্যেও একটা ছক যেন পড়ে ফেলা যায়। পাঁচটি অভিযানে টিনটিনের প্রধান লক্ষ্য রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক অব্যবস্থার প্রতিবিধান করা। আরও দু'টি অভিযানেও প্রসঙ্গসূত্রে এই পরিস্থিতির ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম অভিযানেই টিনটিন ইউরোপীয় রাজধানীগুলি উড়িয়ে দেওয়ার বলশেভিক ষড়যন্ত্র বানচাল করে। এর পর একে একে লাতিন আমেরিকার একনায়কতন্ত্রপ্রধান ব্যানানা রিপাবলিক, বলকান রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র, তৈল রাজনীতি, আরব রাষ্ট্রের জঙ্গি শাসনব্যবস্থা ও সেনা অভ্যুত্থান— এই সবকিছুরই মোকাবিলা করতে হয় তাকে। দেশ-মহাদেশ নির্বিশেষে রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বার্থমগ্ন, ক্ষমতালোলুপ চরিত্রটি হার্জে বারবার তুলে ধরেছেন। তবে আদর্শের দোহাই দিয়ে বাস্তব পরিস্থিতিকে তিনি অবজ্ঞা করেননি। সান থিওডোরাসের কুচক্রী একনায়ক জেনারেল ট্যাপিওকাকে সরিয়ে টিনটিন কেবল আরেকজন একনায়ককেই ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করে। তফাতের মধ্যে, জেনারেল আলকাজার একনায়ক হলেও উদারতর। ওই ভূমিখণ্ডের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে বেমানান, অবাস্তব কোনও সমাধান হার্জে দেননি।

চারটি অভিযানের মূল প্লট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সূত্রে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত। এই প্রসঙ্গেও রাষ্ট্রের স্বার্থলোলুপ দিকটি সামনে এসেছে। যেমন এসেছে মাদকদ্রব্যের আন্তর্জাতিক চোরাকারবারকেন্দ্রিক তিনটি অভিযানেও। রাষ্ট্রীয় মদতে অস্ত্রব্যবসা বা চোরাচালান হার্জের একটি প্রিয় প্রসঙ্গ। তিনটি অভিযানের কাহিনি আবর্তিত হয় প্রত্নদ্রব্য বা পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও সেই সংক্রান্ত রহস্যভেদকে কেন্দ্রে রেখে। এ ছাড়া অপহরণ, চুরি, জালিয়াতি বা ছিনতাই জায়গা পেয়েছে পাঁচটি বইয়ে। এদের মধ্যে 'ফ্লাইট ৭১৪' অভিযানটির অবস্থান স্বতন্ত্র, কেননা

অপরাধ দমনের সূত্রে সত্যিই টিনটিনকে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মধ্যে ফেলেছেন হার্জে— তবে তার মধ্যেও একটা ছক যেন পড়ে ফেলা যায়। পাঁচটি অভিযানে টিনটিনের প্রধান লক্ষ্য রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক অব্যবস্থার প্রতিবিধান করা। প্রথম অভিযানেই টিনটিন ইউরোপীয় রাজধানীগুলি উড়িয়ে দেওয়ার বলশেভিক ষড়যন্ত্র বানচাল করে।

নিছক কোটিপতি ব্যবসায়ীর অপহরণকাণ্ড দিয়ে শুরু হলেও এই প্লটের কেন্দ্রে রয়েছে দানিকেন প্রভাবিত ভিনগ্রহী তত্ত্ব। এবং এই একটিমাত্র অভিযান, যেখানে ঘটনার পরিণতিতে বা রহস্য উদ্ঘাটনে টিনটিনের ভূমিকা প্রায় নেই। এ ছাড়া তিনটি উপাখ্যানে কোনও অপরাধী নেই বা প্রকৃতপক্ষে কোনও অপরাধ ঘটেনি। এই তিনটি বইই পাঠকমহলে প্রবলভাবে জনপ্রিয়। এগুলি হল 'লাল বোম্বেটের গুপ্তধন', যেখানে গুপ্তধন উদ্ধার করাই কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু; 'তিব্বতে টিনটিন'— যেটি বিপন্ন বন্ধুর সন্ধানে টিনটিনের একান্ত ব্যক্তিগত এক অভিযাত্রা; এবং 'পান্না কোথায়', যেখানে নিখোঁজ রত্নের খোঁজ এক ঘরোয়া তদন্ত ঢাকা পড়ে যায় স্নিগ্ধ কৌতুক ও পারিবারিক রসের আড়ালে।

অভিযানসূত্রে হেন যানবাহন নেই, হার্জে যাতে টিনটিনকে চড়াননি। তালিকা বানাতে বসলে সত্যিই কুল মেলে না— মোটরগাড়ি, সাইকেল, মোটরবাইক, ট্রেন, যাত্রীবাহী প্লেন, সি-প্লেন, জঙ্গি বিমান, হেলিকপ্টার, সাবমেরিন, জাহাজ, মোটরবোট, পালতোলা নৌকা, দাঁড় টানা নৌকা, ক্যানো, ভেলা, রবারের ডিঙি, রিকশা, প্যারাশুট, ট্যাঙ্ক, রকেট, অজ্ঞাত মহাকাশযান বা ইউএফও— মায় ঘোড়া, উট, হাতি। বরং সমসাময়িক কোন-কোন যানবাহনে টিনটিন চড়েনি, তা অবশ্যই এক কঠিন গবেষণার বিষয় হতে পারে।

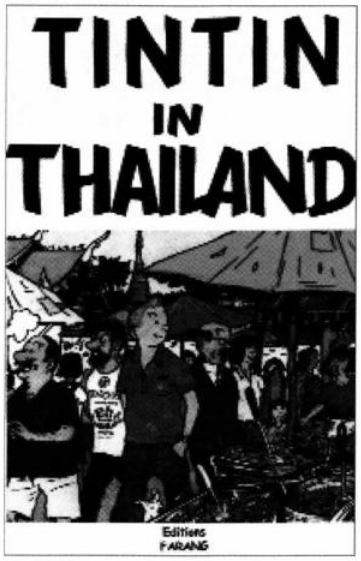

এইরকমই বিহ্বলজনক আরেকটি তালিকার মুখোমুখি হতে হয় টিনটিনের কাহিনিগুলিতে পশুপাখির ব্যবহারের কথা ভাবলে। কুটুস বা স্নোয়ি তো আছেই, কিন্তু তা ছাড়াও প্রতিটি বইতেই হার্জে অগুনতি পশুপাখি ব্যবহার করেছেন; কেবলমাত্র আবহসৃষ্টির জন্য নয়, দস্তুরমতো ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। বাহন হিসাবে ঘোড়া, উট, হাতি বা কঙ্গো অভিযানে আফ্রিকান বন্য জীবনের ব্যবহার যদি আলোচনার বাইরেও রাখি, টিনটিনের বইগুলিতে আমরা দেখব কুকুর, বেড়াল, টিয়াপাখি, কাকাতুয়া, গোরু, ষাঁড়, বাঘ, অ্যানাকোন্ডা, কুমির, ছাগল, গোরিলা, মাকড়সা, প্রজাপতি, হাঙর, হাঁস, লামা, বানর, ইঁদুর, টাপির, পিপীলিকাভুক, চমরি গাই, ছাতারে, প্যাঁচা, কাঁকড়া, নানা জাতীয় মাছ— এমনকী ইয়েতি!

টিনটিন, ক্যাপ্টেন হ্যাডক ও প্রফেসর ক্যালকুলাস— অসমবয়সি, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা এই তিনটি চরিত্রকে হার্জে এক আশ্চর্য সমীকরণে বেঁধেছেন। সিরিজের প্রধান চরিত্র তরুণ রিপোর্টার টিনটিন সম্পূর্ণভাবে অতীতবিহীন এবং পরিবারহীন। অন্য দিকে প্রধান নাবিক ক্যাপ্টেন হ্যাডকের বংশগরিমা ও পারিবারিক সম্পদ তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তার কোনও ভবিষ্যৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। আর এই দু'জনের মাথার ওপর, অনেকটা যেন অভিভাবকের ছায়া নিয়ে বিচরণ করছেন প্রফেসর ক্যালকুলাস— বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, যিনি বয়সে প্রধানতম হলেও প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন আবিষ্কারে মগ্ন; ঘন ঘন বিজ্ঞানীমহলের আমন্ত্রণে ঘুরে বেড়ান বিশ্ব জুড়ে। বিশেষ করে ক্যাপ্টেন হ্যাডকের সঙ্গে ক্যালকুলাসের সম্পর্কের রসায়নটি হার্জের এক অমর সৃষ্টি। ভুললে চলবে না, মার্লিনস্পাইক হল কেনা হয়েছিল ক্যালকুলাসের টাকাতেই। এবং সেই থেকে প্রফেসর পাকাপাকিভাবে এই বাড়িরই বাসিন্দা।

২৬ নম্বর ল্যাব্রাডর স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে, টিনটিনও পরের দিকে পাকাপাকিভাবে মার্লিনস্পাইকেই থাকত কি না, হার্জে তা খোলাখুলি কোথাও জানাননি। কিন্তু কালো সোনার দেশের প্রাথমিক দৃশ্যগুলির পর আর কখনওই আমরা টিনটিনকে লন্ডনের বাসায় দেখি না। এবং সর্বশেষ অভিযান 'বিপ্লবীদের দঙ্গলে'তে আমরা টিনটিনকে ভোরবেলা মার্লিনস্পাইকে ব্যায়ামও করতে দেখি— ঠিক যেমনটা সে লন্ডনের বাসায় করত।

অবশ্য মার্লিনস্পাইকের আকর্ষণে অনেকেই বারবার ছুটে এসেছে। আমিরের ছেলে আবদুল্লা না হয় দলবল নিয়ে এসেছিল নিরাপদ রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রয়োজনে। কিন্তু সপরিবার বিমার দালাল জলিয়ন ওয়াগ বা সপার্ষদ মিলানের কোকিলকণ্ঠী মার্লিনস্পাইকে আসেন স্রেফ ছুটি কাটাতে। অপরাধ, ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত— এই সবকিছুর বিপরীতে শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন মার্লিনস্পাইক তার প্রাকৃতিক শোভা ও অচঞ্চল জীবনযাত্রা নিয়ে যেন এক চিরকালীন মরূদ্যান।

গোয়েন্দা কাহিনির প্রচলিত কাঠামো ব্যবহার করেও হার্জে কিন্তু তাঁর প্রতিটি অভিযানেই এই 'চিরকালীন' মূল্যবোধের ওপর খুব জোর দিয়েছেন। যাবতীয় প্রতিকূলতার সামনে টিনটিনের যে দুঃসাহসী ভাবমূর্তি আমরা দেখি, তার পিছনে দৃঢ় আদর্শ ও সনাতন মূল্যবোধের ভিত্তি রয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের সেই তিন অমোঘ মন্ত্র— liberty, equality, Fraternity— যেন টিনটিনের চিরসঙ্গী। হার্জের কল্পবিশ্বের কথা ভাবলে তাই আমাদের মনেও ফুটে ওঠে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী দিয়ে গড়া এক আনন্দলোক। সেখানে অপরাধ নেই; আছে ভয়শূন্য স্বাধীনতা আর মানবমৈত্রীর চিরবন্ধন। এই জগৎ যেন মনে করিয়ে দেয় জনপ্রিয় ওয়েস্টার্ন চলচ্চিত্র The Big Gundown-এর শীর্ষসঙ্গীতের সেই সনাতন পঙ্‌ক্তি ক'টি—

অভিযানসূত্রে হেন যানবাহন নেই, হার্জে যাতে টিনটিনকে চড়াননি। তালিকা বানাতে বসলে সত্যিই কুল মেলে না— মোটরগাড়ি, সাইকেল, মোটরবাইক, ট্রেন, যাত্রীবাহী প্লেন, সি-প্লেন, জঙ্গি বিমান, হেলিকপ্টার, সাবমেরিন, জাহাজ, মোটরবোট— মায় ঘোড়া, উট, হাতি।

Somewhere there is a land where men do not kill each other./Somewhere there is a land where men call a man a brother./Somewhere you will find a place where men live without fear./Somewhere, if you keep on running, someday you'll be free.

একটু খেয়াল করলেই আমরা দেখব, টিনটিনের প্রতিটি অভিযানেই দৌড় এবং পশ্চাদ্ধাবনের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। প্রায় সবসময়ই কেউ-না-কেউ, কোনও-না-কোনও কারণে দৌড়োচ্ছে! গানটির ওই চতুর্থ পঙ্‌ক্তিটিরই মতো এই নিরন্তর দৌড় যেন এক আলোকোজ্জ্বল স্বাধীনতার চির অন্বেষণ।

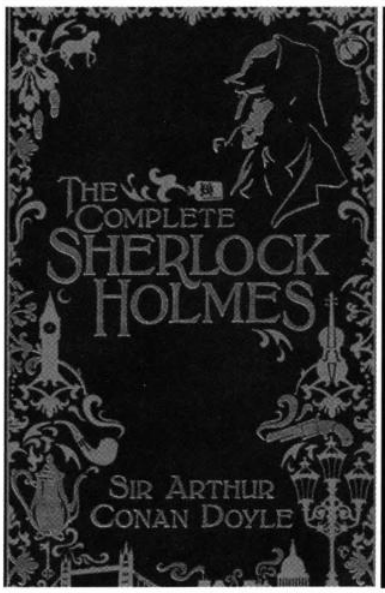

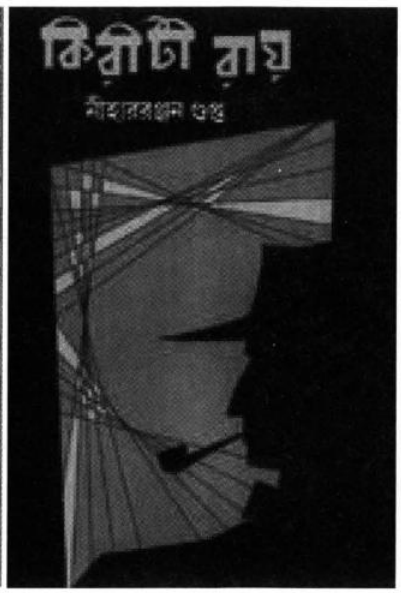

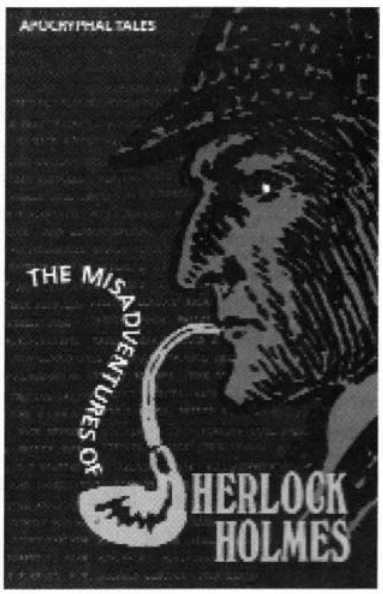

যে গোয়েন্দারা সিনেমায় ব্রাত্য

সুজয় বিশ্বাস

গোয়েন্দা কাহিনি, রহস্য-রোমাঞ্চ গল্প-উপন্যাস নিয়ে উন্নাসিকতার দিন শেষ। বিদেশি সাহিত্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সব রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনিরই মূলে রয়েছে যুক্তিনিষ্ঠ অনুমান, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি এবং সদা সতর্ক বিচারবুদ্ধি। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন গোয়েন্দার কাছে যা প্রাথমিক বিষয়, রহস্য-বুভুক্ষু পাঠকের কাছে তা-ই অনেক। ছোটদের কাছে যা লোভনীয়, গ্রহণীয়, বড়দের কাছেই তা অপাঙ্‌ক্তেয়, অবহেলিত, অমার্জিত। সেই বড়রাই কিন্তু বুঝেছেন তাঁদের চিন্তাভাবনা কত ভুল। অনেক গোয়েন্দা কাহিনি শুধু কিশোরদের মনোরঞ্জন করে না, বড়দেরও মনোরঞ্জন করে। কখনও বৃষ্টিস্নাত রাতে বা শীতের মধ্যাহ্নে বড়দের সময় কাটানোর একটা বড় অবলম্বন হল বই পড়া। আর সে বই যদি গোয়েন্দা কাহিনি, রহস্য গল্প-উপন্যাস হয় তাহলে তো বলারই কিছু নেই।

ইউরোপীয় সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনির প্রবেশ দু'শো বছরও নয়। চসারের ক্যান্টারবেরি টেলস, শেকসপিয়ারের নাটক, মিলটনের কাব্য এবং অন্য সব সাহিত্যিকের গল্প। উপন্যাস, প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় সাহিত্য এগিয়েছে। গল্প-উপন্যাস অধিকাংশই গার্হস্থ্য জীবন নিয়ে। সেখানে গোয়েন্দা কাহিনির স্থান ছিল না। ১৮৪১ সালে গোয়েন্দা কাহিনি সাহিত্যে প্রথম স্থান পায় এডগার অ্যালান পো-র হাত ধরে। পো-র ডিটেকটিভ কাহিনি ছাপা হয়েছিল ফিলাডেলফিয়ার একটি জার্নাল গ্রাহাম ম্যাগাজিনে। 'দ্য মার্ডারস ইন রুমর্গ'। একেই বিশ্বসাহিত্যে প্রথম গোয়েন্দা গল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৮৬৮ সালে গোয়েন্দা উপন্যাস লিখেছিলেন উইল কি কলিনস। নাম 'দ্য মুনস্টোন'। বিদেশি সাহিত্যে এর পর অনেক সাহিত্যিক গোয়েন্দা গল্প, উপন্যাস লিখেছেন এবং তা দেশ থেকে দেশান্তরে জনপ্রিয় হয়েছে। আমাদের এই বাংলাদেশেও সেইসব লেখকের অনূদিত বই যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোমস তো খুবই জনপ্রিয় আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে।

বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনির অস্তিত্ব খুব বেশি দিনের নয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনির খোঁজ পাওয়া যায় না। যতদূর মনে হয়, বিদেশি গোয়েন্দা উপন্যাস-গল্পের প্রভাবেই এ বঙ্গে গোয়েন্দা কাহিনি লেখার সূচনা। এবং স্বাভাবিকভাবে বিদেশি গোয়েন্দা কাহিনির প্রভাব এসে পড়েছে বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতেও। ইংরেজি সাহিত্যে রহস্য উপন্যাস লেখা তো আগেই শুরু হয়েছে। অনেকেই এখানে রহস্য উপন্যাস লিখলেও আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোমসের প্রভাব বেশি লক্ষণীয়। অনেক তো মনে করেন পাঁচকড়ি দে-র গ্রন্থে গোবিন্দরাম শার্লক হোমসের বাঙালি পোশাক পরা মুখ। পাঁচকড়ি দে-র লেখা 'হত্যাকারী কে!', 'নীলবসনা সুন্দরী' পাঠকের কাছে সে দিন হট কেক হয়ে উঠেছিল। তবে পাঁচকড়ি দে-র অনেক লেখাই বিদেশি লেখকদের লেখা থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ডিটেকটিভ কাহিনি লিখেছেন। তাঁর 'দারোগার দপ্তর' পর্যায়ে গল্প লেখা উনিশ শতকের একেবারে শেষ দিকে, বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রহস্য কাহিনি লিখেছেন। একসময় পাঠকের কাছে তা খুব জনপ্রিয়ও হয়ে ওঠে।

শ্বাসরুদ্ধ রোমাঞ্চ, জমাট বাঁধা রহস্য আর কল্পনাতীত শিহরন— কিশোর সাহিত্যের চেহারা আমূল পালটে গেল। কিশোর সাহিত্যের রূপান্তর ঘটল প্রকৃতই হেমেন্দ্রকুমার রায়ের হাতেই। বড়দের জন্য আগে পাঁচকড়ি দে, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় গোয়েন্দা কাহিনি লিখলেও হেমেন্দ্রকুমারই প্রথম ছোটদের জন্য গোয়েন্দা কাহিনি লিখলেন। তাঁর গোয়েন্দা কাহিনি পড়ে

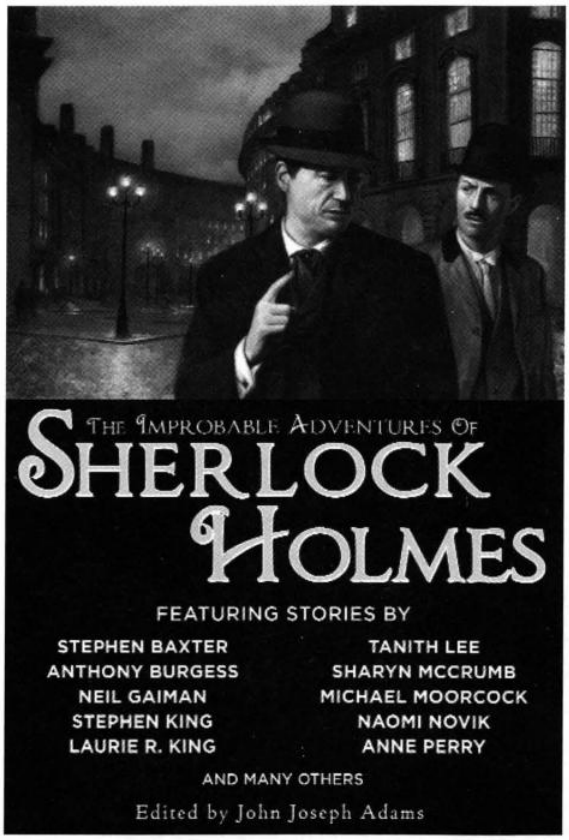

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর নিজেকে গোয়েন্দা বলে পরিচয় দিতে ঘোর আপত্তি। তিনি নিজেকে সত্যান্বেষী বলেই শুধু মনে করেন না, নিজেকে সত্যান্বেষী বলেই পরিচয় দেন। ব্যোমকেশের তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার দৃষ্টি, দীপ্ত বুদ্ধি, সজাগ ইন্দ্রিয়, অসাধারণ সাধারণ জ্ঞান অনেক সময় শার্লক হোমসকে মনে করিয়ে দেয়। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রবার্ট ব্লেক একসময় পাঠক মনে সাড়া ফেলেছিল। আজ লেখক বিস্মৃতপ্রায়।

ছোটরা রহস্যভেদে বিশেষ আনন্দ পায়। তাঁর জয়ন্ত আর মানিক অনেক রহস্য ভেদ করে কিশোর মনে অনাবিল আনন্দ দান করেছে।

সব গোয়েন্দা কাহিনির মূলে যুক্তিনির্ভর অনুমান, পর্যবেক্ষণ আর সদা সতর্ক বিচারবোধ। শার্লক হোমস তাঁর সহকারী ওয়াটসনকে বলেছিলেন, 'এলিমেন্টারি, মাই ডিয়ার ওয়াটসন, এলিমেন্টারি।' তীক্ষ্ণবুদ্ধি গোয়েন্দাদের কাছে যা 'এলিমেন্টারি', রহস্যের খোঁজে থাকা কিশোর পাঠকদের কাছে তা কিন্তু অনেক। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ বক্সীও এই ওষুধ ব্যবহার করে পাঠককে আকর্ষণ করেছিলেন। রহস্যভেদী, রহস্যসন্ধানী, সত্যান্বেষী, সত্যসন্ধানী— যে নামেই তাঁকে ডাকা হোক না কেন, গোয়েন্দা উপন্যাসের নায়ক তো এই রহস্যভেদীই। তিনি খুনি, জালিয়াত, অপরাধ চক্রের মাথা— যে কোনও ধরনের অপরাধীকে পরাস্ত করবেনই। সাহিত্য সমালোচকরা বলেন, বাংলা ভাষায় নবীন ধারায় ডিটেকটিভ উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ব্যোমকেশ বক্সী তো অনেক অসাধ্যসাধন করেছেন।

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর নিজেকে গোয়েন্দা বলে পরিচয় দিতে ঘোর আপত্তি। তিনি নিজেকে সত্যান্বেষী বলেই শুধু মনে করেন না, নিজেকে সত্যান্বেষী বলেই পরিচয় দেন। ব্যোমকেশের তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার দৃষ্টি, দীপ্ত বুদ্ধি, সজাগ ইন্দ্রিয়, অসাধারণ সাধারণ জ্ঞান অনেক সময় শার্লক হোমসকে মনে করিয়ে দেয়। তবে ব্যোমকেশের একটা পৃথক সত্তা রয়েছে। প্রকৃতই গোয়েন্দা সাহিত্যকে জাতে তুলেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই লিখেছেন, 'ব্যোমকেশ হোমসের মতো উৎকেন্দ্রিক প্রকৃতির নয়, বিজ্ঞানদক্ষ নয়, গুণী বেহালাবাদক নয়, নেশাখোর নয়। সে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বাঙালী যুবক— শিক্ষিত, মেধাবী, তৃতীয় দৃষ্টি, সংযতবাক্, সহৃদয়। তার চারিত্রে, মনস্বিতা ও গাম্ভীর্য নেই যাতে তাকে সমান স্তরের সমান বয়সের বাঙালী ছেলের থেকে স্বতন্ত্র মনে করতে হয়।' সেদিক থেকে বলতে হবে, ব্যোমকেশে বক্সী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক সৃষ্টি। ব্যোমকেশের ধরনধারণ সাধারণ বাঙালি ভদ্রলোকের মতোই। তার অসামান্যতার পরিচয় কিন্তু সহজে পাওয়া যায় না। 'বাহির হইতে তাহাকে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া একবারও মনে হয় না যে তাহার মধ্যে অসামান্য কিছু আছে। কিন্তু তাহাকে খোঁচা দিয়া বা প্রতিবাদ করিয়া একটু একটু উত্তেজিত করিয়া দিতে পারিলে তাহার ভিতরকার মানুষটি কচ্ছপের মত বাহির হইয়া আসে। সে স্বভাবত স্বল্পভাষী কিন্তু ব্যঙ্গবিদ্রুপ করিয়া তাহাকে একবার চটাইয়া দিতে পারিলে তাহার ছুরির মত শানিত ঝকঝকে বুদ্ধি সংকোচ ও সংযমের পর্দা ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে। তখন তাহার কথাবার্তা সত্যই শুনিবার মত বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।'

শার্লক হোমস, ডাঃ থর্নডাইক, মিস মার্পল, ফাদার ব্রাউন, এরকুল পোয়ারো, লর্ড পিটার উইমসি, অ্যালবার্ট কাস্পিয়ন প্রমুখের মেলায় ব্যোমকেশ বক্সী ফেলনা নয়। এদের তুলনায় তার যোগ্যতাও কিছু কম নয়।

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রবার্ট ব্লেক একসময় পাঠক মনে সাড়া ফেলেছিল। আজ লেখক বিস্মৃতপ্রায়। তাঁর গোয়েন্দা কাহিনি পাশ্চাত্য অনুসারী। পাঁচের দশকের দুই জনপ্রিয় লেখক শশধর দত্ত ও স্বপনকুমার। এঁরা দু'জনেই কিশোর মনকে সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যতার আলো-ছায়া ঘেরা জগতের সন্ধান দিয়েছেন। শশধর দত্তর মোহন সিরিজের কাহিনিগুলি রুদ্ধশ্বাসে পড়ার মতো। মোহনের মতো চরিত্র বাংলা সাহিত্যে বিরল। মোহন দরিদ্রের বন্ধু, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব। ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতো তার কোনও সহকারী নেই। সে তো একাই একশো। রুদ্ধশ্বাসে পড়ার মতো রোমাঞ্চকর কাহিনি।

পাঁচের দশকে স্বপনকুমারের গোয়েন্দা কাহিনির এক একটার দাম ছিল আট আনা। আজকের হিসেবে পঞ্চাশ পয়সা। উনি একসময় থাকতেন আমাদের বাড়ির কাছে আলমবাজারে। তাঁর গোয়েন্দা কাহিনির ডিটেকটিভ দীপক, সহকারী রতন। তাঁকে এই গোয়েন্দা কাহিনি নিয়ে লেখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এককথায় তিনি বলেছিলেন, কিশোর মনে আনন্দ দিতেই তাঁর এই লেখা। সে সময় স্বপনকুমারের এইসব গোয়েন্দা কাহিনি খুব ভালো চলত। তিনি শশধর দত্তর মতোই জনপ্রিয় ছিলেন।

পেশায় চিকিৎসক নীহাররঞ্জন গুপ্ত কিরীটী রায়ের অমর স্রষ্টা। তাঁর

গোয়েন্দা উপন্যাস বই হয়ে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে বিক্রি। এমনই জনপ্রিয় লেখক নীহাররঞ্জন গুপ্ত। যে বয়স্করা গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাস ছোটদের পাঠযোগ্য বলে মনে করতেন, তাঁদের ধারণাটাই পালটে দিয়েছিলেন নীহাররঞ্জন। তিনি এমনভাবে তাঁর কাহিনিগুলি লিখেছেন, তা কিশোরদের জন্য লেখা হলেও বড়দের কাছেও সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

কিরীটী রায় তো রহস্য-রোমাঞ্চ খোঁজা কিশোর মনের নায়ক। কল্পনার পাখায় উড়ে কল্পনার রঙে রং মিশিয়ে উড়ে চলার নেশা তো কিশোর মনের। তাই অতীতে ভূতপ্রেত, দৈত্যদানবের সঙ্গে রাজা, রানি, পক্ষীরাজপুত্র, কোটালপুত্রের এলাহি কাণ্ডের গল্পগাথা ভালো লাগত কিশোরদের। দিন যায়, পরিস্থিতি পালটে যায়। কিশোর মনের ভাবনারও পরিবর্তন হয়। তাদের মনকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনি। নীহাররঞ্জন গুপ্ত কিরীটী-দীপকের সাহায্যে কিশোর পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করেছেন। তবে নীহাররঞ্জন এমনভাবে রহস্য উপন্যাস লিখেছেন, যা নবীন-প্রবীণ উভয়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। সকলেই আনন্দ পেয়েছেন। কিরীটী রায় সকলের কাছেই জনপ্রিয়।

লেখক কিরীটী রায়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এককথায় অনবদ্য, 'প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ চেহারা। মাথা ভর্তি কোঁচকানো চুল, ব্যাকব্রাশ করা। চোখে পুরো লেন্সের কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমা। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। মুখে হাসি যেন লেগেই আছে। সদানন্দ, আমুদে।' এই বর্ণনাতেই কিরীটী রায় পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যান। কিরীটী রায়ের কমন সেন্স পাঠককে জোগায় রোমাঞ্চকর উত্তেজনা। কিরীটী রায় সুশৃঙ্খল যুক্তিবিশ্বাসের দ্বারা অপরাধীর কার্যপরম্পরাকে বিশ্লেষণ করেছেন। পাঠকের মনে কিরীটী রায়ের ব্যক্তিত্ব, তার তীব্র-তীক্ষ্ণ যুক্তিবোধ, পরিমিতিবোধ, বুদ্ধির মালিন্যমুক্ত ঔজ্জ্বল্য, যা কিরীটী রায়কে সমসাময়িক ডিটেকটিভ কাহিনির নায়কদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছে। আর তার স্রষ্টাকে দিয়েছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রত্যক্ষ সাফল্য। ব্যোমকেশ বক্সী ইন্টেলেকচুয়াল, জনপ্রিয় হলেও কিরীটী রায়ের মতো জনতার প্রিয় হতে পারেননি।

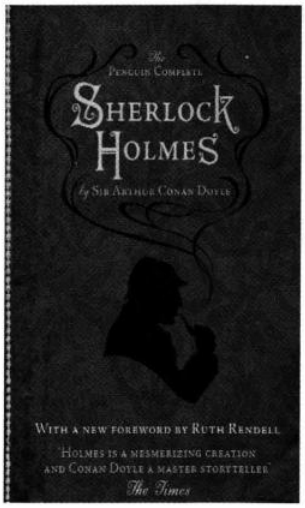

সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সিরিজ বাঙালি পাঠকের কাছে নিঃসন্দেহে খুবই জনপ্রিয়। সত্যজিৎ রায়ের এসব কাহিনি যখন প্রকাশিত হয়েছে, তখন প্রবীণ-নবীন পাঠক তা সংগ্রহ করে পড়েছেন। চলচ্চিত্রে ফেলুদা চরিত্রের অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ফেলুদা-ব্যোমকেশের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ব্যোমকেশ আমার বরাবরের প্রিয়। ফেলুদা যদিও ভালো লাগে, ব্যোমকেশের মধ্যে নানা ধরনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার একটা পৃথক বিচক্ষণতা আছে, পরতে পরতে। কিন্তু ব্যোমকেশের বাঙালিয়ানা অনেক বেশি সাহেবি। আমজনতার চেনা। কিন্তু মধ্যবিত্ততাও আছে তার মধ্যে।' আসলে ব্যোমকেশ বক্সীর নরম-কোমল বাঙালিয়ানা যেমন পছন্দ আমজনতার, তেমনি তার বুদ্ধির বিশ্লেষণী ক্ষমতাও পছন্দ করত বাঙালি সমাজ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-সহ আরও অনেক সাহিত্যিক গোয়েন্দা কাহিনি লিখেছেন।

পাঁচ-ছয়ের দশকে গোয়েন্দা কাহিনির এত রমরমা, এত জনপ্রিয়তা যখন, তা নিয়ে বাংলা ছবি কেন হল না? রহস্য পত্রিকা, রোমাঞ্চ পত্রিকা, গোয়েন্দা পত্রিকা তখন প্রতি মাসে বের হত। এ ছাড়া অন্য অনেক সাময়িক পত্রেও গোয়েন্দা কাহিনি বেরোত। নিশ্চয়ই এসবের পাঠক ছিল, না হলে এসব কেউ প্রকাশ করতেন না। এসব কাহিনি নিয়ে ছবি করার সুযোগ ছিল। পরেও গোয়েন্দা কাহিনির চিত্ররূপ খুব বেশি দেওয়া হয়নি। একমাত্র শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'টি কাহিনি ও সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা কাহিনির চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে, অথচ বিদেশি ভাষায় গোয়েন্দা কাহিনির অনেক ছবিই তো হয়েছে। সেসব জনপ্রিয়ও হয়েছে। বাংলা গোয়েন্দা ছবিও জনপ্রিয় হত। আসলে মনে হয় গোয়েন্দা কাহিনি জাতে ওঠেনি। প্রযোজক-পরিচালকদের কাছে গোয়েন্দা কাহিনি অচ্ছুত ছিল। অথচ অপরাধমূলক অনেক ছবিই হয়েছে। অনেক ছবিতে ধীরাজ ভট্টাচার্য, বিকাশ রায় খলনায়ক হয়েছেন। 'কালোছায়া', 'জিঘাংসা', 'হানাবাড়ি', 'সাদাকালো' ইত্যাদি ছবি হয়েছে। অহীন্দ্র চৌধুরি দু'একটি ছবিতে খলনায়ক হয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রর কাহিনি অবলম্বনে সুশীল মজুমদার পরিচালিত 'অভিযোগ' ছবিতে খলনায়কের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন ছবি বিশ্বাস। 'শেষ অঙ্ক', 'বাঘবন্দী খেলা' প্রভৃতি ছবিতে খলনায়ক হিসেবে উত্তমকুমারের অভিনয় কি ভোলা যায়?

অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় 'দস্যু মোহন' নিয়ে ছবি করেছিলেন। দস্যু মোহন হয়েছিলেন প্রদীপকুমার। এ ছবিও প্রেক্ষাগৃহে ভালোই চলেছিল।

পাঁচ-ছয়ের দশকে গোয়েন্দা কাহিনির এত রমরমা, এত জনপ্রিয়তা যখন, তা নিয়ে বাংলা ছবি কেন হল না? বেরোত। নীহাররঞ্জন গুপ্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অনেক কাহিনি নিয়ে ছবি হলেও, কিরীটী-জয়ন্তকে নিয়ে কোনও ছবি হয়নি।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অনেক কাহিনি নিয়ে ছবি হলেও, কিরীটী-জয়ন্তকে নিয়ে কোনও ছবি হয়নি। সেক্ষেত্রে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগ্যবান। তাঁর গোয়েন্দা কাহিনি 'চিড়িয়াখানা'র চিত্ররূপ দেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। আর ব্যোমকেশ হয়েছিলেন বাংলা ছবির ম্যাটিনি আইডল উত্তমকুমার। ১৯৬৭ সালে মুক্তি পাওয়া 'চিড়িয়াখানা' ও 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' ছবিতে উৎকৃষ্ট অভিনয়ের জন্য ভারতশ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। সাতের দশকে অভিনেত্রী-চিত্র পরিচালিকা মঞ্জু দে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সজারুর কাঁটা'র চিত্ররূপ দেন। দু'টি ছবিই ভালো চলেছিল। কিরীটী রায় সত্যিই বাংলা ছবিতে উপেক্ষিত। তাঁর অনেক গোয়েন্দা কাহিনিরই চিত্ররূপ দেওয়া যেত এবং সেসব ছবি ভালোই বলত। প্রযোজক-পরিচালকদের উদাসীনতা, অনীহাই কিরীটী রায়কে ছবিতে নায়ক করার পরিপন্থী ছিল। নীহাররঞ্জন গুপ্তর কিরীটী রায় যখন বাংলা ছবিতে জায়গা করে নিতে পারেননি, তখন স্বপনকুমারের দীপক কীভাবে জায়গা পাবেন ছবিতে? অথচ আজ গোয়েন্দা কাহিনি নিয়ে ছবি করার প্রবণতা বেশ বাড়ছে। কিরীটী রায়রা কি সত্যিই ব্রাত্য থাকবেন?

হুনুর, গোয়েন্দা, সত্যান্বেষী, ডিটেকটিভ— নানা নামে ডাকা হয় এঁদের। অপরাধীদের মধ্যে প্রবল প্রচলিত নামটি হল 'টিকটিকি'। গোয়েন্দাদের পিছনে ধাওয়া করে 'সমসাময়িক বাংলা'র জন্য অনেক আকর্ষণীয় প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন **অভিজিৎ সুকুল**।

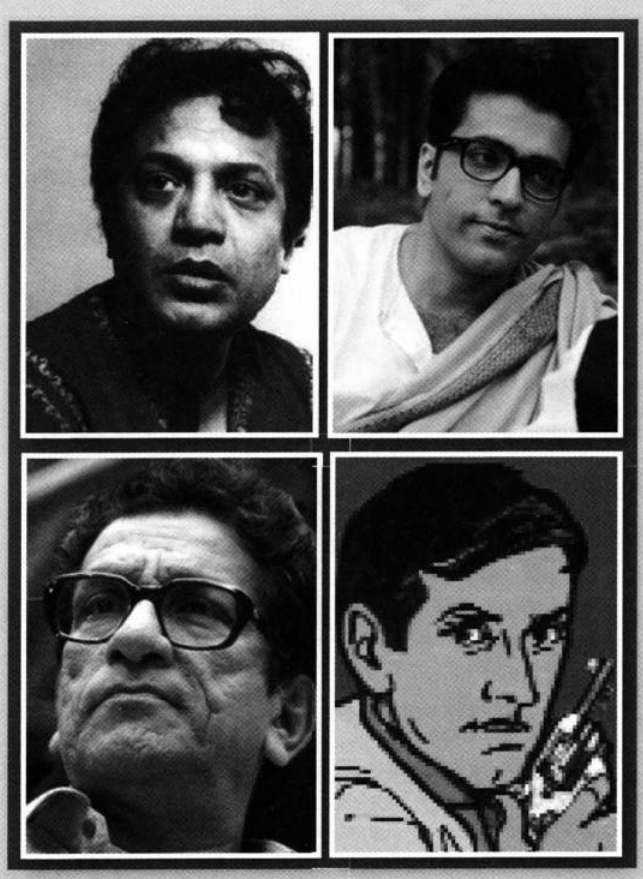

বিষয় গোয়েন্দা

মাস দুয়েক আগে ক্রাইম রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত ভোটে সর্বকালের সেরা 'হুডানইট' গোয়েন্দা কাহিনির শিরোপা পায় এরকুল পোয়ারোকে নিয়ে লেখা আগাথা ক্রিস্টির উপন্যাস 'দ্য মার্ডার অব রজার অ্যাকরয়েড'।

■

ব্রিটিশ রহস্য ঔপন্যাসিক হেনরি রেমন্ড ফিৎসওয়ালটার কিটিং সৃষ্টি করেছিলেন গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর গণেশ ঘোটেকে। তাঁর গল্প অনুযায়ী ঘোটে হলেন মুম্বই পুলিশের কর্মচারী। মজার ব্যাপার হল, কিটিং নিজে জীবনে কোনও দিনও ভারতবর্ষে পা রাখেননি!

■

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেক ইংরেজ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যর হুকাকাশি জাপানি, শিবরামের কল্কেকাশি কোরিয়ান চরিত্র। আজ পর্যন্ত আগাথা ক্রিস্টির লেখা বই বিকিয়েছে চারশো কোটিরও বেশি। বিক্রির দিক থেকে তাঁর আগে শুধু আছে উইলিয়াম শেকসপিয়রের লেখা এবং বাইবেল।

■

নলিনী দাশের গোয়েন্দা গন্ডালু আসলে চারটি মেয়ের একটি দল— কালু, মালু, টুলু আর বুলু।

এবারের প্রশ্ন

১। বিমল কর সৃষ্ট কিকিরা চরিত্রটির পুরো নাম কী?

২। প্রথম গল্পে কোন বিখ্যাত গোয়েন্দা অতুলচন্দ্র মিত্র ছদ্মনামে আত্মপ্রকাশ করেছিল?

৩। কোন গোয়েন্দা তথা অ্যাডভেঞ্চার নায়কের সৃষ্টির পেছনে অন্যতম প্রেরণা ছিলেন ড্যানিশ অভিনেতা পালে হাল্ড।

৪। কোন লেখকের লেখায় 'সুকৌশলী' নামের একটি প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির নাম পাওয়া যায়?

৫। ১৯২৬ সালে দ্য স্কেচ পত্রিকায় প্রকাশিত 'দ্য টিউজডে নাইটক্লাব' নামের এক ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে কোন গোয়েন্দার আত্মপ্রকাশ ঘটে?

৬। রজিত কাপুর, উত্তমকুমার, আবির চট্টোপাধ্যায় এবং সুশান্ত সিং রাজপুত— এঁরা প্রত্যেকেই কোন গোয়েন্দার চরিত্রে অভিনয় করেছেন বা করবেন?

৭। গোয়েন্দা শবর দাশগুপ্তকে কে সৃষ্টি করেছিলেন?

গত সংখ্যার উত্তর—

১) মুন্সি প্রেমচাঁদ ২) ও হেনরি ৩) জীবিত ও মৃত ৪) সাদাত হাসান মান্টো ৫) আন্তন চেকভ ৬) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৭) গি দ্য মপাসাঁ